সুরবালা

উপন্যাস।

শ্রীমতী প্রাণকিশোরী দেবী

প্রণীত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

PRINTED BY SARAT COOMAR SEN AT THE

GREAT TOWN PRESS.

163, Musjeedbari Street—CALCUTTA.

1892.

পাবলিক লাইব্রেরী।

এখানে সকল প্রকার, নাটক, নভেল, কবিরাজী, ইস্কুল পুস্তক, নাগরী, অর্থ, আইন, প্রভৃতি অতিমাত্র সুলভে পাওয়া যায় ও ডাকে পাঠাইয়া থাকি।

পারুলবালা উপন্যাস	।৵০	রামায়ণ	॥৵০
কনকচাঁপা উপন্যাস	।৵০	মহাভারত	১৲
ঠাকুরদাদার গল্প	।০	সুরসুন্দরী উপন্যাস	॥/০
প্রেম-সঙ্গীত	।০	লীলাময়ী উপন্যাস	॥০
রহস্য সঙ্গীত	।০	ত্রিবেদী সন্ধ্যা	।০
খ্যামটা সঙ্গীত	।০	নামসংগ্রহ	।০
যৌবন সঙ্গীত	৵০	হেমলতা উপন্যাস	॥০
সুরবালা উপন্যাস	।৵০	কিরণবালা	।৵০
সচিত্র সঙ্গীত কৌমুদী বা বিনা ওস্তাদে গান বাজনা শিক্ষা।	১৲	গোপাল ভাঁড়	।৵০
		সন্দেশমিঠাই	।০
		রাণীচৌধুরাণী	১৲
পারস্য উপন্যাস	।০	পাঁচটী মেয়ে	॥০
বাসর সঙ্গীত	৵০	কবিরাজী শিক্ষা	॥৵০
ভিখারিণী	।৵০	খনার বচন	॥০
থিয়েটার সঙ্গীত	।৵০	মানবজীবন	॥০
ভোজবিদ্যা	।৵০	কৃষ্ণকাহিনী	।৵০
মেয়েমাত্র	।০	ধীরেন্দ্রবিনোদিনী	।৵০
কামরত্ন	১।০	থিয়েটার টপ্পা	।৵০
সরলা সুন্দরী	।৵০	তিনটী মেয়ে উপন্যাস	।৵০
উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা	১৲	কিরণবালা উপন্যাস	।/০
রাজকুমার উপন্যাস	।৵০	রাজকুমারীর গুপ্তকথা	৵০
নরমেধ যজ্ঞ	১।০	স্ত্রীর সহিত কথোপকথন	॥০
শ্রীমন্তের মশান	১।০	স্বর্ণবাই	।০

১৩৮ নং গরানহাটা } শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কলিকাতা।

সুরবালা

যৌবন সঞ্চার।

দামোদর নদের পশ্চিম পারস্থিত শঙ্করী নামক গ্রামে আমার জন্মস্থান। একখানি বড় চৌরী মেটে ঘর একটী ভাঙ্গা চণ্ডী-মণ্ডপ ও দুই চারি খানি চালা ঘর মাত্র আমাদের বাস-বাটী। জ্ঞান হ'য়ে অবধি শুন্‌লেম যে মা আমার কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিয়ে হ'য়ে পর্য্যন্ত কখন শ্বশুর বাড়ী যান নি, বাবা কখন কখন মাকে কুটুম্ব আত্মীয়ের মত দেখ্‌তে আস্‌তেন, কিন্তু চার পাঁচ বছর পূর্ব্বে টাকার জন্যে ঝগড়া ক'রে অবধি আর আসেন নি। আমাদের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কখন কাহাকেও দেখি নাই, কেবল নিশির মা ব'লে একটী কৈবর্ত্তের মেয়ে আমাদের বাটীর কায কর্ম্ম করিত। শঙ্করী গ্রামের বাসবাটী আমার বাপের নহে, এটী আমার মামার বাড়ী। আমাদের পুরুষবল না থাকায়, যে সব জমা জমী ছিল, সে সকল চাষিদের সঙ্গে ভাগে চাস করা হ'তো, তারা নগদ টাকার পরিবর্ত্তে বছরে দুই বার ক'রে ধান দিত। মা সে ধান কতক বা ঘর খরচের কারণ মরাইয়ে তুলিয়ে রাখ্‌তেন, কতক বা মহাজনদের বিক্রয় ক'রে টাকা নিতেন। মা আমার নিজ হস্তে আয় ব্যয় দেনা পাওনার হিসাব লিখে রাখ্‌তেন, আমার মত তিনিও বাপের একটী মেয়ে ব'লে এবং তখন আমার মাতামহের সময় ভাল থাকায়, তিনি

মেয়েকে ভাল ক'রে লেখা পড়া শিখিয়েছিলেন, গ্রামস্থ মেয়ে মহলে আমার মা সকলের সকল বিবাদের মীমাংসা করতেন। সকলের দেনা পাওনার মিচিল মিটাইতেন। গ্রামের শুধু মেয়ে ছেলে নয়, পাড়ার আর আর পুরুষেরাও মাকে সকলে মান্য করিতেন। গ্রামস্থ ছোট বড় সকল মেয়েরা মাকে রাঙ্গা দিদি বলিয়া ডাকিত, কারণ আমার মা ডাকের সুন্দরী ছিলেন, সর্ব্বদা পূজা আহ্নিকে রতা, ঠাকুর সেবা না ক'রে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করতেন না, আমিও আট ন বছর প্রায় সকল কুচো দেবতার পূজা, ধ্যান, প্রতিষ্ঠা, প্রাণায়াম শিখেছিলেম, মায়ের যত্নে আমিও ছেলে বেলা থেকে লেখা পড়া শিখতে আরম্ভ ক'রেছিলেম, আমাদের বসত বাড়ীর খিড়কীতে আমাদের আর একখানি খুব বড় বাগান ছিল। নিশির মা আমাদের বাগানের পাহারা দিত। নিশির মা আফিম খায়, সে সমস্ত রাত্রি ঘুমায় না, নিশির মায়ের ভয়ে কেউ বাগানে প্রবেশ করে না। আমি সন্ধ্যা হ'লে ছেলে বেলা হ'তেই নিশির মায়ের কাছে গল্প শুনতে যেতেম, নিশির মা কত ভূতের গল্প, কত রাজা রাণীর গল্প, কত রাক্ষসের গল্প ব'লে আমায় ঘুম পাড়াত। আমি ঘুমুলে নিশির মা আমায় ঘরে রেখে যেতো। মায়ের সাঁজ সকালে পূজার ব্যাঘাত হ'তো ব'লে মা কখন আমার উপদ্রব-সহ্য করতে পারতেন না। পুকুরের মাছ, বাগানের তরকারী, গোলার ধান, আর এ ছাড়া পাঁচটা সিধে পত্রে আমাদের এক রকমে সুখে দুঃখে গুজরান চলিত। এই রকমে আর দু পাঁচ বছর কাটিল, ক্রমে আমার নিশির মায়ের কাছে সন্ধ্যাবেলা গল্প শুনতে যাওয়া বন্ধ হ'য়ে এলো, কেননা পূর্ব্বে নির্ভয়ে দিন রাতে

ছুটে বেড়াতেম, কিন্তু আজ কাল আর সে রকম পারি না। আগে কোমরে আঁচল বেঁধে পুকুরের বাগানে লুকোচুরি খেলতে যেতেম, কিন্তু আজ কাল যেন একটা লজ্জা ভাব এসে উপস্থিত হ'লো, পুরুষ দেখলেই গায়ে, মাথায় কাপড় দিতে হয়, শরীর একটু ভার ভার হ'তে আরম্ভ হ'লো, দৌড়ুতে লজ্জা হয়, স্নানের সময় চারিদিকে চেয়ে দেখি, সাঁতার দেওয়া বন্ধ হ'লো। সন্ধ্যা বেলা আর পাড়ায় বেরুতে সাহস হয় না, যেন গা ছম্ ছম্ করে, কে যেন পিছনে আস্‌ছে বোধ হয়, আর ছেলে বেলার উপদ্রব নাই, ব'সে ব'সে চুপ ক'রে মায়ের পূজা আহ্নিক দেখি, আর পাড়া প্রতিবাসিনীদের সঙ্গে ধাওয়া ধাওই হয় না, তাদের কথায় আর পূর্ব্বের ন্যায় হাসি কৌতুক আসে না, যেন কিসের অভাব বোধ হ'তে লাগ্‌লো কি তা জানিনা, কিন্তু যেন কেউ কাছে থাক্‌লে দুজনে মৃদু মৃদু কথা কইতে ইচ্ছা করে, বাগানে পুকুর ধারে হাত ধরাধরি ক'রে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে রকম কেউ নাই কেন তাও ভাবি। আজ ওপাড়ার বোসেদের ছোট জামাই এসেছে, সরলা আজ আর খেলতে এলোনা। কাল ঘোষালদের কামিনীর ভাতার এসেছে, সে আর কদিন আস্‌বে না, সকলেরই সব আসে, কিন্তু আমার আর কেউ আসে না। মনে এক একবার ভাবি যে, কেন কেউ আমার আসে না, আমার কি আস্‌বার কেউ নাই! এক একবার মনে করি যে, মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো, কিন্তু মুখ ফুট্‌তে গেলেই কেমন যেন গলা শুকিয়ে যায়, আর কথা বেরোয় না। মুখের কথা মুখেই থাকে, ছমাসেও বলা হ'লো না, মা পূর্ব্বাপর আমায় খাওয়ান, দাওয়ান, পড়ান, কিন্তু কখন মুখের দিকে বেশীক্ষণ

চেয়ে থাক্‌তেন না, কিন্তু আজ কাল তাঁর নিজের কাজ ছেড়েও যেন আমাকে নিয়ে বিব্রত হ'লেন, নিজে চুল বেঁধে দেওয়া, নিজে কাছে ডেকে শোয়ান, আর কত রকম উপদেশ দেওয়া প্রভৃতিতে তাঁর অনেক সময় যেতে লাগ্‌লো, আর তিনি সাঁজ সকালে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকেন আর আড়ালে গিয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন। আমি ঐ রকম মাকে এক দিন কাঁদ্‌তে দেখে ধ'রে বল্‌লুম ;—

আমি। হ্যাগা মা! তুই আমার মুখ পানে চেয়ে থেকে কাঁদিস্ কেন ?

মা। বাছারে! আমি যে কেন কাঁদি, তা তোকে কি বল্‌বো? যতই তোর বয়েস বাড়্‌ছে, ততই আমার মনের আগুন জ্বলে উঠ্‌ছে! এমন সোণার মেয়ের কপাল যে এমন পোড়া, তা আমি কি করে জানবো।

আ। (কপালে হাত বুলিয়ে) কৈ মা! আমার কপাল তো পোড়েনি, তা হ'লে আমি কি জাস্তে পারতেম না, কি জ্বালা করতো না ?

মা। সে পোড়া নয় হাবি, এ যে ভেতরের পোড়া! কুলীন ভাতারের সুখ নিজে জেনে অনেক খুঁজে পেতে ছেলে বেলায় তোর বিয়ে দিয়েছিলুম, কিন্তু সকল সাধে ভগবান বাদ সাধলে। এ রূপের ডালি যে কি ক'রে রাখ্‌বো, তাই ভেবে ভেবেই সারা হ'লেম।

মায়ে ঝিয়ে কথা সাঙ্গ হ'লে, মা চোখ মুচ্‌তে মুচ্‌তে রান্না ঘরে গেলেন, আমি আকাশ পাতাল ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ড ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম।

কাল বন্যা।

আমাদের মায়ে ঝিয়ে যে রাত্রে কথা হয়, তার পর দিন থেকে আমার চোখে জগৎ সংসার নূতন ধরণের বোধ হ'তে লাগ্‌লো। ঘোর বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল! হাসির কথায় আমার আর হাসি আসে না, খেলা ধূলোয় আর মন বসে না, শরীরের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মনও যেন বিষম ভার-যুক্ত হ'য়ে পড়্‌লো। স্নান কর্‌তে বেড়াতে যেতে আগে কত আমোদ বোধ হ'তো কিন্তু আজ কাল যেন আর সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিশ্‌তে ইচ্ছা করে না। সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌লে যে আমার প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। প্রৌঢ়া রমণীরা আমাকে দেখ্‌লেই পরস্পরে কি বলাবলি করে, সমবয়স্কারা কেহ বা একটা পরিহাস করে, কিন্তু গিন্নিরা শুনলেই তাদের ভর্ৎসনা করেন ব'লে আমাকে কেউ আর ঠাট্টাও করে না, খাওয়া পরায় আমার পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন নাই, ক্রমে বোধ হয় মুখশ্রী মলিন হ'তে লাগ্‌লো দেখে মা আমায় মধ্যে মধ্যে বল্‌তেন "সুরবালা! মা আমার দুঃখিনী মায়ের অনেক যত্নের ধন, তুমি ছেলে মানুষ, অত ভেবনা, হরিপদে মন রেখো, হরি তোমার এ জন্মে না হয় পর জন্মে ভাল করবেন, ধর্ম্মে মতি রেখো, সতীত্বই রমণীর সার ধর্ম্ম।" মায়ের উপদেশ গুলি আমি প্রত্যহই চিন্তা করি। এই রূপে আরো ছমাস কাটিল, কিন্তু যে বিধাতা আমায় শৈশবেই বিধবা করে'ছেন, তিনি কি আমায় দীর্ঘকাল সুখে রাখ্‌বেন,

কথনই নয়, আমার অধোপতনের কাল অতি শীঘ্রই নিকট হইয়া আসিয়াছে।

দামোদরের চড়ার নিকটস্থ গ্রাম সকল প্রায়ই বৎসর বৎসর বন্যার জলে প্লাবিত হয়, আমাদের গ্রামও তার পার নহে। তবে বন্যা বহুদিন হয় নাই। বর্ষাকালে মালপুর উচ্ছেনালা প্রভৃতি স্থানে বন্যায় জল আসে, কিন্তু দু এক দিনের বেশী থাকে না। আমার ছেলে বেলায় একবার বড় বন্যা হয় শুনেছি, কিন্তু আমার জ্ঞান হয়ে অবধি দেখি নাই। দেখ্‌বার বড় ইচ্ছা, কিন্তু তা ঘটে নাই।

আজ শ্রাবণ মাসের ২১ তারিখ। তিন দিন থেকে আকাশে সূর্য্যের উদয় নাই, অনবরত মুষলের ধারে বৃষ্টি। গ্রামের পথ ঘাট পুষ্করিণী সব জলে পরিপূর্ণ। বাড়ি থেকে কারো বেরোবার উপায় নাই, হাট বাজার দোকান প্রভৃতি সব বন্ধ, বাহির হইবার মধ্যে শুদ্ধ জেলে মালারা বিলে নালায় মাছ ধরিতেছে।

বেলা ১১ টা। মা পূজা আহ্নিক সারিয়া রান্না চড়াইতে গেলেন, আমি দাওয়ায় বসিয়া উঠানের জলে চালের ছাঁচের জল পড়িয়া কেমন ফড়িংএর ন্যায় হাঁ করিতেছে, তাহাই একদৃষ্টে দেখিতেছিলাম, এমন সময় নিশির মা তালপাতার টোকা মাথায় দিয়া বাড়ির মধ্যে আসিয়া কহিল, "রাঙ্গা দিদি, বাদলে সুরি কদিন মাছ খেতে পায়নি ব'লে আমি ভাবছিলুম, এমন সময় বাগানের নালা থেকে এই রুই মাছটা বড় আম তলায় লাফিয়ে পড়্‌লো। আর ভাসায় এত মাছ বেরিয়েছে, যে হাত দিয়ে ধরা যায়। এই ব'লে নিশির মা একটা বড় মাছ রান্না ঘরের দাওয়ায় ফেলে দিলে। ছোট বেলা থেকে মাছ ধরার

আমার বড় বাতিক! মাচের গাঁদি লেগেছে শুনে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লেম। "কোথায় গাঁদি লেগেছে, নিশির মা?" মা আমার মেছো বাতিক বিলক্ষণ জান্‌তেন। আমার ভাব দেখেই ব'ল্লেন, তুচ্ছ মাছের জন্যে এক গোছা চুল ভিজুলে এ বাদলে শুখোবি কেমন ক'রে?

তোর পায়ে পড়ি মা "নিশির মা টোকাটা দেতো।" এই মাত্র ব'লে টোকা মাথায় দিয়ে বাগানের দিকে ছুটলুম, বহুদিনের পর আমারও একটু উৎসাহ দেখে মা কিছু আর আপত্তি ক'ল্লেন না। তিন লাফে চির পরিচিত বড় আঁব তলায় উপস্থিত হ'লেম। নিশির মা যা ব'লেছিল তা সম্পূর্ণই সত্য। বাগানের নালায় যথার্থই মাছের গাঁদি লেগেছে। আঁচল ছেকনি দিয়ে মাছ ধর্‌বার মানসে কোমরের কাপড় খুলছি, এমন সময় দূরে একটা মহা গোল উঠ্‌লো, সেই বৃষ্টি পড়া শব্দ ভেদ ক'রে সেই ঘোর আর্ত্তনাদ রব গাছে নালায় মাঠে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি চঞ্চল চক্ষে চারিদিকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, মাছ ধরা আর আমার মনে নাই। যা দেখ্‌লেম, তাতে আমার হৃদয়ের শোণিত-প্রবাহ স্থির হ'য়ে গেল। চক্ষু নিমিষ-শূন্য, হাত পা নিশ্চল, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হ'লো। গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড মাঠের পরিবর্ত্তে শুদ্ধজলময় সাগর। সেই বিস্তীর্ণ সাগরের উপর উত্তর পশ্চিম দিক হ'তে দশহাত উচ্চ ঢেউয়ের মুখে কত কি অস্পষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ভেসে আস্‌ছে দেখ্‌তে পেলেম। পরক্ষণেই সেই তরঙ্গ তাড়িত বস্তুগুলি গরু মেষ, ছাগ, মানুষ, ভাঙ্গা গৃহ চাল প্রভৃতিতে পরিণত হ'ল। এক্ষণে সেই বহুদূরস্থিত আর্ত্তনাদের বিশেষ কারণ হৃদ্বোধ

হ'ল। সেই জলরাশির উপর মহাবেগবান তরঙ্গ প্রবাহের ভীষণ শব্দ, সেই শব্দ ভেদ করে নর নারীর ভীষণ চীৎকার, দেখ্‌তে-দেখ্‌তে কতকগুলি ডুবে গেল আর উঠ্‌লো না, যে বন্যা দেখ্‌বার জন্যে মনে মনে কত সাধ কর্‌তেম, সেই বন্যার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি স্তম্ভিত। অন্যের বিপদ দর্শনে প্রাণ কেঁদে উঠলো, কিন্তু সেই বিপদ যে আমাকে বেষ্টন ক'রেছে, তা আমি লক্ষ করি নাই। ঢেউয়ের প্রবল তেজে গ্রামের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, গ্রামে জল ঢুকিয়াছে, সমস্ত ভাসিয়াছে, কিন্তু আমার কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

হঠাৎ আমার মোহ ভাঙ্গিল। চিরপরিচিত মায়ের চীৎকার শুনিলাম "সুরি! পালিয়ে আয় পোড়ারমুখী সর্ব্বনাশী মর্‌লি" শব্দ অনুসারে সেই দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম নিমিষের কারণ মায়ের সেই এলোচুল ঘেরা চাঁদপানা মুখখানি দেখ্‌লেম, মায়ের কোলে যাবার কারণ যেন হাত দুটা বাড়াইলাম, কিন্তু মাকে ধরিতে পারিলাম না, বজ্রের ন্যায় তীব্র তেজে এক প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া আমার বক্ষে আঘাত করিল, আত্মরক্ষা করিবার জন্য গাছের একটী ডাল ধরিবার চেষ্টা করিলাম, সে চেষ্টাও বিফল হইল। পরক্ষণেই আমি সেই বন্যার জলে ভাসিয়া চলিলাম। একবার মাত্র যখন সেই ঢেউয়ের উপর হইতে বাহিরে দেখিলাম, তখন গ্রাম হইতে কোন্‌ দিকে গিয়াছি, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তার পর সংজ্ঞা শূন্য হইলাম। স্বপ্নে শুদ্ধ মায়ের মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল।

অনুরাগ

যখন আমি চক্ষু চাহিলাম, দেখিলাম যে আমি একটী সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ মধ্যে অতি কোমল শয্যার উপর শায়িত, গৃহের বাতায়নগুলি কোন সবুজ বর্ণের পর্দ্দায় আবৃত, গৃহটী অতি মনোহর দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ, যে সকল দ্রব্যাদি আমি কখন চক্ষে দেখি নাই, ভাল ভাল কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক, দেরাজ, আলমারি, খাট, উপরে টানা পাখা ও বড় বড় ঝাড়, মধ্যস্থলে একটা প্রস্তর নির্ম্মিত মেজের উপর সদ্য তোলা কতকগুলি ফুল ও একটী বৃহৎ তোড়া দেখিলাম। সেই পুষ্প সৌরভে ঘরটা একেবারে আমোদিত হইয়াছে। এই সব দেখে প্রথমে ভাব্‌লেম, যে আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, নতুবা আমি কোথা? এ কাদের ঘর, আমি এখানেই বা কেমন ক'রে এলেম! এ সকলই অলীক! পুনর্ব্বার চক্ষু বুজিলাম, বাম হস্তের অঙ্গুলী দিয়া কপালের শিরা চাপিয়া ধরিলাম। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। আমি বন্যাজলে ভাসিয়াছিলাম, কে আমাকে রক্ষা করিল? এবং কিরূপেই বা আমি এখানে আসিলাম। তবে কি আমার মা নিকটে নাই। তবে কি আমি পরের বাড়ীতে আছি, কত দূরে? আমি যে এখানে আছি, তা কি মা জানে? বালিস হইতে মাথা তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না, বুঝিলাম যে আমি বড় দুর্ব্বল। ভাবিলাম যে মা নিকটে থাকিলে আমায় কোলে করিয়া উঠাইতেন। আপনা আপনি সহসা ডাকিয়া ফেলিলাম "মা!"

আমার মুখ হইতে শব্দটা বাহির হইবামাত্র বোধ হইল যেন কে একটী স্ত্রীলোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃদু পাদক্ষেপণ পূর্ব্বক একটী বড় কোলঙ্গার কাছে গেলেন, সেটা অনেক বোতল ও শিশিতে পোরা, তার ভিতর হইতে একটী শিশি নিয়া কাচ পাত্রে কি ঢালিলেন এবং আস্তে আস্তে আমার শয্যার ধারে আসিয়া বড় কোমলস্বরে বলিলেন মা এই টুকু খাও, তাহ'লে এখনি কথা কহিতে পারবে, এই বলিয়া সেই ঔষধি টুকু আমার মুখে ঢালিয়া দিলেন।

আমার জন্ম ধারণে ডাক্তারি ঔষধ কখন খাই নাই, ছেলে বেলায় ব্যারাম হ'লে মা আমার চিকিৎসা করিতেন; কখন কখন "সেন বুড়ো" আদার রস পানের সহ দিয়া দু একটা বড়ি খাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু এ ঔষধির কি গুণ! উদরস্থ হইবামাত্র যেন আমার দেহের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল। দুর্ব্বল হস্ত পদ সবল হইল, চোখের তেজ বৃদ্ধি হইল, আমি স্পষ্ট বাক্‌শক্তি পাইলাম।

সেই রমণী আমার হাতটা ধরিয়া খাটের উপর বসিলেন। এবং ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "মা! তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হ'য়োনা, দু এক দিন বেশী কথা কবারও চেষ্টা ক'র না, তুমি বড় দুর্ব্বল, তোমার কোন ভয় নাই, এখানে তোমাকে যত্ন করিবার লোক আছে।" আমি ইঙ্গিতে শুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলাম, এ অবস্থায় আমি কত দিন আছি? "সতের দিন" এই বলিয়া তিনি দ্বার দিয়া চলিয়া গেলেন। পাছে অধিক কথা কহিলে আমার শরীরের অনিষ্ট হয়, এই ভাবিয়া রমণী চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনের চিন্তা তিনি লইয়া যাইতে পারিলেন না।

সতের দিন আমি এই শয্যায় শুইয়া আছি, তবেত যমের মুখ হইতে ফিরিয়াছি. কিন্তু কে আমারে জীবনদান করিল? আমার জীবনরক্ষক, পুরুষ না স্ত্রীলোক? এ কথা আমি বার বার ভাবিতে লাগিলাম; কেন ভাবিলাম, তা আমি নিজেই জানি না, কিন্তু আমার জীবনদাতা যেন কোন পুরুষই হয়, পুরুষ হইবে বৈ আর কি? বন্যা জলের তীব্র তরঙ্গ-তাড়িত ডুবু ডুবু একটী রমণীকে রক্ষা করা কি রমণীর সাধ্য? কখনই না, যাক, এটী ঠিক্ স্থির হইল যে, আমার রক্ষাকর্ত্তা পুরুষ। কিন্তু তিনি দেখিতে কিরূপ? তিনি কি কাল কুঁজো কুরূপ-বিশিষ্ট। না না, তা কি কখন হয়? যার রূপ গুণ যৌবন নাই. সে কি কখন পরের জন্যে প্রাণ দিতে পারে? যার বাহ্যিক মন্দ, তার ভিতর কখন ভাল নয়। যিনি সুন্দর তিনিই সরল, যিনি বলবান তিনি সকল রমণীর রক্ষাকর্ত্তা, যিনি নিজে বহু গুণবিশিষ্ট, তিনি অন্যের গুণের পক্ষপাতী।

আমার জীবনদাতা যে, কোন সুন্দর সুপুরুষ, এ কথাটা বলিবার আমার আর একটা তাৎপর্য্য আছে; কেন না,. আমি যে কয়দিন পীড়িত অবস্থায় প'ড়েছিলাম, প্রলাপে কত কি বকিতাম, প্রবল জ্বরের যাতনায় ছটফট ক'রিতাম তখন বোধ হ'তো যেন কোন সুন্দর যুবা পুরুষ আমার কপালে কোন সুশী-তল দ্রব্য মাখাইয়া দিতেন, আপনি পাখা লইয়া বাতাস করি-তেন, আর এ ছাড়া বালিস হইতে মাথা গড়াইয়া পড়িলে অতি যত্নপূর্ব্বক তাহা উপাধানে তুলিয়া দিতেন, এলায়িত কেশগুলি অতি সন্তর্পণে বাঁধিয়া দিতেন, তৃষ্ণার সময় কোন কোমল পদার্থ ভিজাইয়া আস্তে আস্তে বিন্দু বিন্দু করিয়া আমার মুখে জল

দিতেন, এ গুলি আমার ক্রমে ক্রমে বেশ মনে হইতে লাগিল। তিনি ভিন্ন কি আর অন্য ব্যক্তি আমার রক্ষাকর্ত্তা হইতে পারে? না, অন্যের আমাকে এত যত্ন হইবে কেন? তিনি আমাকে জল হইতে তুলিয়াছেন, তাই আমার উপর তাঁর আদর। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে আবার নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে সেই সুন্দর মুখ খানি যেন আমার মধ্যে মধ্যে মনে পড়িতে লাগিল।

সাক্ষাৎ দর্শন—প্রেম।

পরদিন প্রাতঃকালে সেই রমণী আবার মৃদুমন্দ পাদক্ষেপণপূর্ব্বক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তার পর, খাটের উপর বসিয়া আমার হাতটী ধরিলেন। আমি আজ রমণীকে ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁর বয়ঃক্রম আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর। অঙ্গের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, হাত পা গুলি গোলাল, পরণে সাদা ধুতি, মাথার চুল এক গাছিও পাকে নাই দাঁত গুলিও পরিষ্কার চিক্কণ, হাসি টুকু বড় মিষ্ট।

রমণী যত্ন সহকারে আমার হাতখানি ধরিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে তা কি তোমার মনে পড়ে? আমি বলিলাম, "খুদ কুড়ি। শাঁকারী" রমণী পুনশ্চ কহিলেন, "মা! তোমার আপনার আর কে ছিল;" আমি কহিলাম, "আমার মা, আমি, আর নিশির মা।"

রমণী ক্ষণকাল নীরব হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কিছু-

ক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ মা! তোমার নামটী কি?" আমি কহিলাম, "সুরবালা।" রমণী স্নেহের সহ বলিলেন, "আহা উপযুক্ত নামটী!" তোমার বাপের নাম কি ? আমি বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। বাবার নাম আদৌ জানি না, কারো মুখে শুনিও নাই, মাও বলেন নাই।

রমণী বলিলেন, "লজ্জা কি মা! সকলই ভগবানের হাত, তোমার একলা ব'লে তো নয়, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

আমি মার মুখ মনে করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। বুঝিলাম যে আমার অন্বেষণে আসিয়া আমার রাঙ্গা মা সেই বন্যার জলস্রোতে জীবন হারাইয়াছেন। এ কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না। আমার ভাব দেখিয়া রমণী উঠিলেন। যাবার সময় বলিলেন, "মা! তোমার কাহিল শরীর, কেঁদোনা ঠাণ্ডা হও, আমায় আবশ্যক হ'লে ডেকে পাঠিও। বাহিরে অন্য ঝী আছে, বামাঠাকুরুণকে ডেকে দিতে ব'ল্লেই তারা আমায় খবর দিবে।" এই বলিয়া বামা ঠাকুরুণ চলিয়া গেলেন। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর একটু বেড়াইতে লাগিলাম। কিছু পরে একটী বাতায়নের নিকট একখানি সবুজ পর্দ্দা অপসারিত করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার সেই বাসগৃহের নীচেই একখানি অতি চমৎকার বাগান। আমাদের গ্রামের বাগানের মত নহে। এ বাগানখানি অতি সুদৃশ্য ও নানা রকম নূতন ধরণে সাজান। চারিদিকে স্তরে স্তরে শ্রেণী করা সব ভাল ভাল ফুলের গাছ। মধ্যে দিয়া তিন চারি হাত পরিমাণ খোয়া কেলা রাস্তা। মধ্যে মধ্যে পাথরের নানা রকম বিচিত্র আসন। আর অন্য দিকে

বড় বড় তাল, নারিকেল, জাম প্রভৃতি সু-রসাল ফলের বৃক্ষ। মধ্যস্থলে একটী সুবিস্তীর্ণ পুষ্করিণী। চতুর্দ্দিকে পাথর দিয়া বাঁধান ঘাট। বাগানের শোভা দেখিতে দেখিতে আমি সব চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছি! পুষ্প-সৌরভ ঘ্রাণে আমার মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছে, আর শান বাঁধান ঘাটের চাঁদনীর মধ্যে এক খানি উৎকৃষ্ট গালিচায় বসিয়া একটি যুবা পুরুষ এক খানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি এককালে মুগ্ধ হইলাম।

পাড়াগেঁয়ে মেয়ে সুন্দর সুপুরুষ যথার্থ কাকে বলে, তাতো কখন দেখি নাই। আমাদের গ্রামের ঘোষালদের মহেন্দ্র, বোসেদের দেবেন্দ্র, ঘোষেদের যোগেন্দ্র, গঙ্গোপাদের সুরেন্দ্রকেই সুন্দর পুরুষ মনে করতেম; কিন্তু যাকে আমি আজ দেখিলাম, তাঁর ন্যায় সুপুরুষ কখন চক্ষে দেখি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই।

যুবকের বয়ঃক্রম বাইশ তেইশ বৎসর। অঙ্গের লাবণ্য ছটায় যেন ঘাট আলো করিয়া রহিয়াছে। মাথার কেশ গুলি কিছু কুঞ্চিত, কিন্তু সুদীর্ঘ কবরীর ন্যায় কাঁদে পড়িয়াছে। ভ্রু যোড়াটী যেন তুলী দিয়ে আঁকা। তিনি চক্ষু দুটী নত করিয়া পুস্তক দেখিতেছিলেন, সেই জন্য তাঁর দৃষ্টি আমার উপর পতিত হয় নাই। ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন থাকায় ভিতর হইতে চিক্কণ দন্তের আভা দেখিতে পাইতেছিলাম, নাকটী যেন বাঁশীর মত। দেহ খানি স্থূলও নয় কৃশও নয় দোহারা, গলায় সুদীর্ঘ যজ্ঞোপবীত। সহসা মন বড় আনন্দিত হইল, ঐ পৈতা গাছটা দেখিয়া মন আনন্দিত হইল, কেন হইল তা বলিতে পারি না। কেন, তিনি আমার কে যে, তাঁর গলায পৈতা দেখিয়া আমার আনন্দ হইল, তিনি শূদ্র হইলে কি আমার এত আনন্দ হইত না? বোধ হয় না? কেন

না, যদিও তাঁর রূপ দেখিলেই মন বিমুগ্ধ হইত, তত্রাচ সেই পৈতা গাছটীতে যেন তাঁর সৌন্দর্য্য সহস্র গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। হঠাৎ তাঁকে দৃষ্টিমাত্র যেন কোন পবিত্র দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইল। আমি আর তাঁর উপর হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। যেন কোন অলক্ষিত মায়াসূত্র আমাকে তাঁর দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

সহসা যুবক মাথা তুলিলেন। এবং বাতায়নের দিকে দৃষ্টি করিলেন। চারি চক্ষু একত্রিত হইল। পলকের মধ্যে সেই মুখ মনে পড়িয়া গেল। পীড়ার সময় যিনি আমায় বাতাস করিতেন, যিনি আমার মুখে শীতল বারি প্রদান করিয়া জ্বরের তৃষ্ণা হইতে পরিত্রাণ করিতেন, যিনি আমার পতিত মস্তক উপাধানে তুলিয়া দিতেন, যে মুখ আমি স্বপ্নে কতবার দেখিয়াছি, সেই মুখ আজ চাক্ষুষ দেখিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি পুস্তক ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁর মুখমণ্ডলে যেন ক্ষণকালের কারণ হাসি দেখা দিল; আমি, যেন বাণবিদ্ধা কুরঙ্গিণীর ন্যায় তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি এককালে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, সেখান হইতে আমি এক পাও নড়িতে পারিলাম না।

যুবক আমার মনের ভাব কতকটা বুঝিয়া যেন মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই বাগানের উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিয়াই নিকটস্থ একটী বাক্স হইতে কি একটা যন্ত্রের ন্যায় বাহির করিয়া চক্ষে দিয়া সেই দিকে বারম্বার দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমি বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার অঙ্গ ভঙ্গী দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে তিনি যেন কিছু চঞ্চল হইলেন। চক্ষু হইতে

সেই যন্ত্রটীকে নামাইয়া পরিধেয় বসনে সেই যন্ত্রের অগ্রভাগ মুছিয়া ফেলিলেন। পুনর্ব্বার যন্ত্রটী চক্ষে দিয়া সেই দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমিও সেই দিকে চাহিলাম।

দেখিলাম যে, ঐ বাগানের কিছুদূরে এক খানি বৃহৎ উচ্চ অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার ছাদের উপর দাঁড়াইয়া এক-জন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ, ঐরূপ একটী যন্ত্র চক্ষে দিয়া আমাদের দিকে দেখিতেছে।

তখন আমার চৈতন্য হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে দূরের পদার্থ ভালরূপে নিকটে দেখায়। তবে ত সেই ব্যক্তি আমাকেই এতক্ষণ দেখিতেছিল। যুবক বোধ হয় তাহা বুঝিয়াই ঐরূপ যন্ত্রের দ্বারা তাহার ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। আমি বুঝিলাম যে, আমার ওরূপ ভাবে ওখানে দাঁড়ান ভাল হয় নাই; কিন্তু আমি কিরূপে জানিব? কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে ঐ ব্যাপারটা আমার যেন কেমন ভাল লাগিল না। আমার সুখ সূর্য্যের কিরণ পথে যেন একখানি মেঘ—কালিমা বর্ণের মেঘ আচ্ছাদিত করিল। আমি বাতায়নে পর্দ্দা টানিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া আসিলাম। যেমন পশ্চাদ্-দিকে ফিরিলাম, অমনি একখানি বৃহদায়তন দর্পণে আমার সমস্ত দেহটী প্রতিবিম্বিত হইল।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! শুনিলে বোধ হয় আপনারা হাসিবেন, কিন্তু জন্মাবধি আমি কখন দর্পণে মুখ দেখি নাই; কেন না, আমি নিজে কখন চুল বাঁধি নাই, মুখ মুছি নাই। মা আমায় ধরে, বেঁধে চুল বেঁধে দিতেন ও মুখ মুছে দিতেন। অনেক মেয়ে পান খেয়ে ঠোঁটের রঙ্ দেখবার কারণ টিপ পরবার

কারণ আয়নাতে মুখ দেখে থাকে, কিন্তু আমার সে অভ্যাস কখন ছিল না। সামনে দর্পণ থাকলেও আমি কখনই দেখ্‌তেম না, কিন্তু আজ সেই বৃহদ্দর্পণে নিজের অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়া আমি আপনা আপনিই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলাম। যখন প্রথমে আমার ছায়া, দর্পণে পড়ে, তখন আমি মনে করিলাম যে, আমার পাশে বুঝি কোন অপ্সরা দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকেই দেখিতেছি, কিন্তু পরক্ষণেই আমার সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বুঝিলাম যে, ঐ দর্পণ মধ্যে আমার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, প্রত্যয়েরজন্য হাত তুলিলাম, প্রতিবিম্বও হাত তুলিল; দুই হাত তুলিলাম, সেও তাহা করিল; আমি হাসিলাম, বিম্বও হাসিল, মাথার কাপড় খুলিলাম, সেও কাপড় খুলিয়া বাঙ্গ করিল। তখন বুঝিলাম, যে দর্পণ মধ্যে আর কেহ নয়, আমিই বটে। তখন ভাল করিয়া আমি আমাকে দেখিতে লাগিলাম।

আপনার রূপের গর্ব্ব করতে লজ্জা করে; শুনেছি, করতেও নাই। কিন্তু আমি আপনার রূপের কথা বল্‌তে চাই না, দর্পণে যা দেখেছি, তাই বল্‌ছি। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমার বয়স এখন ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

'আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তাতে আধুনিক কবি নই যে, নানা রকম পুরাতন আড়ম্বরী ক'রে ব'ল্‌বো। মোটামুটী যা মনে আসে তাই বলি। তার পর, আপনারা নিজের পসন্দ মত ভেঙ্গে চুরে গড়িয়ে নেবেন।

মুকুজ্যেদের পাণি, ঘোষালদের মণি, বাঁড়ুজ্যেদের কিরুণী, বোসেদের কামিনী, চক্রবর্ত্তীদের ভূতী প্রভৃতির মত আমি নোদা গোদা নাক চ্যাপটা আঁকা বাঁকা যে সে মেয়ে নই।

আমার রংটী দুধে আল্‌তায় গোলা টুকটুকে গোলাপী, টুস্‌কী মার্‌লে রক্তের ছড়া পড়ে।

আমার মাথার চুল গুলি কোঁকড়ান কোঁকড়ান, অথচ ঠিক্ শ্যামাঠাকুরুণের মত পায়ের গোছে পড়ে। কপাল খানি অর্দ্ধ-চন্দ্রের ন্যায়, ভ্রূ যোড়াটী ঠিক্ সাপের লেজের মত দুধার সূক্ষ্ম, অথচ মধ্যস্থলে স্থূল। আপনার চক্ষের দৃষ্টি আপনি কখন দেখি নাই, কিন্তু বোধ হয় আমার এ দৃষ্টি পুরুষের পক্ষে বড় বিপ-জ্জনক। একটী পটলকে দু ফালি ক'রে চিত্রকরে যেন বসিয়ে দিয়েছে, ভিতরে পূর্ণ জ্যোতি, সর্ব্বনেশে কটাক্ষ। নাকটী কাটা-রির মত, না, সেটা ভাল কথা নয়, গ্রামে তিল ফুল ফুট্‌তে অনেক দেখেছি, সেই রকম হবে। লোকে ঠোঁট লাল ক'র্‌তে পাণ খায়, আল্‌তা দেয়, কিন্তু আমার এ ঠোঁটে রং ফলাতে হয় না, আপনা আপনি যেন রং টুক্ টুক্ ক'চ্চে, সুরসে ফেটে প'ড়্‌ছে, তার মধ্য দিয়ে মুক্তার শ্রেণীর মত দাঁতগুলির আভা যেন জ্যোৎস্নার জ্যোতি বিকীরণ ক'র্‌ছে। কর্ণ দুটী, দুধারে যেন কেশজালের শোভা পরিবর্দ্ধিত কর্‌বার কারণ সগর্ব্বে বিস্ফারিত হ'য়ে মস্তকের দুধারে পরিদৃশ্যমান হ'য়ে আছে। বাহু দুটী আমার নব শালকোঁড়ার ন্যায়, নিম্নভাগে যেন চেঁচে সরু করা। হাত দুখানি, রক্ত পদ্মের বর্ণবিশিষ্ট; অঙ্গুলি কটী আফুটো চাঁপার কলির ন্যায়, অগ্রভাগগুলিতে যেন কুচো কুচো চাঁদের কণায় সাজান। বক্ষঃস্থলটী প্রশস্ত, ক্রমে কটীদেশে সূক্ষ্ম ভাব ধারণ করেছে, এত সূক্ষ্ম যে হঠাৎ বোধ হয় যে, মহা গুরুভারযুক্ত পয়োধর-ভার বহনে অসমর্থ হ'য়ে হয়তো কোন দিন ভেঙ্গে প'ড়্‌বে। কিন্তু কেন যে পড়ে না, সেইটী শুদ্ধ বিশ্বনির্ম্মাতা জগ-

দীশ্বরের নির্ম্মাণ কৌশল। তার পর উরুদেশ এত নিবিড় যে, দাঁড়ালে যেন দুটী রম্ভা বৃক্ষ একত্রে রোপিত হওয়ার কারণ যুক্ত-ভাব ধারণ করেছে। পা দুখানি অতি ক্ষুদ্র, লক্ষ্মী-ঠাকুরুণের মত। বাকী রৈল নিতম্ব আর চলন। পূর্ব্বেরটা নিজে দেখ্‌তে পাই না, হাত দিলে ভাল বোধ হয়। আর চলন, তা রাজহংসী কি মারলীর চলনই যে খুব ভাল, তা আমার বোধ হয় না, আমার চলনটী ধীর স্থির অর্থাৎ সাম্‌নে পশ্চাতে গুরুভার দ্রব্যাদিনিয়ে যে রকম ক'রে যাওয়া যায়, সেই রকম। গলার আওয়াজটী আমার কোকিলের মত কুহু কুহু ক'রেও ওঠে না, বীণার মত ঝঙ্কারও দেয়না, মোটা মুটীর উপরে আমার স্বর টুকু সুমিষ্ট; কথা কইলে লোকের কাণেও লাগে প্রাণেও বিঁধে; যে একবার শোনে সে আর ভোলে না। এই ত গেল রূপের কথা—আমি যতদূর পারি, ততদূর ব'ল্লেম; তার পর আপনারা আপন ইচ্ছামত গড়িয়ে পিটিয়ে নেবেন, তাতে আমার কোন লাভ লোক্‌সান নাই। বৃহদায়তন মুকুর মধ্যে আজ নিজের রূপ দেখে আমার মনে যেন একটু অহঙ্কারের উদয় হইল। কেন হইল? তা আমি জানি না; কিন্তু এইটে জানি যে, যাঁকে দেখে আমার মন মুগ্ধ হইয়াছে, যাঁকে দৃষ্টিমাত্র স্বর্গীয় দেবতা জ্ঞানে মনে মনে কত কি ভেবেছি, আমি বোধ হয় তাঁর অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন নই। এটাই বা মনে উঠ্‌লো কেন? আমি তাঁর সমতুল্যই হই বা নিকৃষ্টই হই, তাতে তাঁর ক্ষতি কি? আচ্ছা, আমি তাঁর জন্যে যতক্ষণ ভাব্‌ছি, তিনি কি আমার জন্য সেইরূপ ভাব্‌চেন? পোড়া কপাল আর কি! তাঁর আকার ইঙ্গিতে বোধ হয় তিনি কোন বড়লোকের ছেলে, আমার মত একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের কারণ তিনি ভাব-

বেন, এ কি কখন সম্ভব হয়? তাঁহার রূপ আছে, গুণ আছে, অতুল ধন আছে; তিনি মনে কর্‌লে আমার মত কত দাসী ঘরে কিনে রাখ্‌তে পারেন; আমি তাঁর কিসে যোগ্যা হব? আমায় ভাব্‌তে তাঁর ব'য়ে গেছে! তাইত! আমার মনের কি অহ-ঙ্কার! কি তেজ! কি দর্প! তিনি যে আমায় জল থেকে বাঁচিয়ে-ছেন, এই আমার কত ভাগ্যের ফল; তার ওপর আমার আবার ত স্পর্দ্ধা অল্প নয়! কিন্তু আমি যে সুন্দরী, এটী বড় সুখের বিষয়। তিনি আমায় ভাবুন বা নাই ভাবুন, কিন্তু আমি সুন্দরী, অবশ্য আমার জন্য তাঁকে একদিন না একদিন ভাব্‌তে হবে। মন ব'ল্লে হবে না, আমি বল্লুম হবে। আমি যদি সতীলক্ষীর মেয়ে হইত আমার জন্য তাঁকে ভাব্‌তে হ'বেই হ'বে। মনেতে আমাতে এক লক্ষ টাকার বাজী হ'লো। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে আমার মোহ ভঙ্গ হইল। আমি গায়ে মাথায় কাপড় দিয়ে শয্যার ধারে গিয়া দাঁড়ালেম। বামাঠাক্‌রুণ হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ব'ল্লেন, "কি মা সুরবালা! আজ কেমন আছ? তোমাকে আজ উঠে বেড়াতে দেখে সবাই বড় খুসী হ'য়েছে। এই কথা বলিতে বলিতে বামাঠাকুরুণের মুখশ্রী যেন আরো কিছু প্রসন্নতা ভাব ধারণ করিল। আমি মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, "হ্যাঁগা ঠাকুরুণ! কয়দিন চৈতন্যলাভ করে অবধিত সবাইয়ের মধ্যে তোমাকে দেখ্‌চি, আর সবা-ইটে কে গা বাছা? বামাঠাকুরুণ আমার কথা শুনিয়া একবার কড়িকাঠের দিকে চাহিলেন, তার পর মেজের দিকে দেখিলেন, তার পর এধার ওধার চেয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, "হ্যাঁগা বাছা! আমি ছাড়া তোমার দুঃখ দরদ ভাব্‌তে আর কি

কেউ নাই গা? আর তুমি আমা ছাড়া আর কারেও কি দেখনি গা?” আমি কিছু অপ্রতিভ হইলাম। “দেখি নাই”—এ কথা বলা আমার ভাল হয় না, কাজেই আমি সাহসের সহিত বলিলাম, ঠাকৃরুণ আমি বন্যার জলে ভাসিয়াছিলাম, কি রূপে রক্ষা পাই-লাম, তাহার কোন তত্বই জানি না, কোথায় আছি, তাহাও জানি না, কে আমাকে মৃত্যুমুখ হ'তে রক্ষা করিলেন, দুর্ভাগ্য-ক্রমে এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকেও দেখিলাম না। হ্যাগা! কার বাড়ীতে আছি? কে এই হতভাগিনীকে রক্ষা করিয়াছেন? তাহাও জানি না, এই কথা বলিতে বলিতে আমার মাকে মনে পড়িল। সর্ সর্ করিয়া চক্ষে জল আসিল। বামাঠাকুরুণ আঁচল্ দিয়া আমার চক্ষের জল মুছাইয়া কহিলেন, “মা! যিনি তোমাকে রক্ষা করি-য়াছেন, তিনি নিকটেই আছেন, যখন তুমি ভালরূপে আরোগ্য হইবে, তখন তাঁহার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইবে।” এই বলিয়া বামাঠাকৃরুণ আমার দিকে বক্রদৃষ্টি করিলেন।

আমার মুখমণ্ডল সলাজে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

আমি রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কহিলাম। “ঠাকৃরুণ! তুমি আজ হ'তে আমার মা, আমি কিরূপে প্রাণ পাইয়াছি, তাহার বৃত্তান্ত কি শুনিতে পাই না?”

বামাঠাকুরুণ কহিলেন, “তাতে আপত্তি কি মা! কিন্তু যিনি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁর মুখে শুনিলেই ভাল হয় না?”

আমি মুখ নত করিয়া রহিলাম। বামাঠাকুরুণ ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিলেন না মা! একেবারে সে আড়ম্বরীতে কায নাই, আমি যত দূর দেখেছি, তাই বলি।”

এবারে আমি মুখ তুলিলাম।

বামাঠাকুরুণ আমার হাতটী ধরিয়া বলিলেন, "দেখ মা! তোমার কথা বল্‌বার পূর্ব্বে আমার নিজের বিষয় একটু বলা আবশ্যক। আমার বাড়ী মেদিনীপুর। আমার বাপ একজন জমীদার ছিলেন। আমার পিতার কাল হওয়ায়। আমার মাতা তাঁর সঙ্গে আগুনখাকী হ'য়ে সহমরণে যান। আমার স্বামী বিদেশে চাকরী কর্‌তেন। আমার বিপদের কথা শুনে তিনি কর্ম্মস্থান হ'তে বাড়ী আস্‌ছিলেন; কিন্তু পথে দস্যুতে তাঁকে মেরে ফেলে সব লুট পাট ক'রে নেয়, তাঁর সঙ্গের এক চাকর শুদ্ধ বেঁচে আসে, তার মুখেই আমি সব সংবাদ পাই। আমার ত্রিবিধ বিপদের সংবাদ পেয়ে আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা সব বিষয় পত্র দখল করিয়া নেয়। তার পর আমার উপর অন্য রকম অত্যাচার কর্‌বার চেষ্টা করায়, আমি গ্রামের অন্য কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া থাকি। সেখানে থেকে শুন্‌লেম যে, আমার মায়ের মাস্‌তুতো ভগিনীর পুত্র হেমচন্দ্র রায়, তমলুকে জমীদারী দেখ্‌বার কারণ অবস্থান কর্‌চেন। হেমচন্দ্রের বয়স অতি অল্প, পিতার মরণে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেখান হ'তে তাঁকে এক পত্র লিখি ও আমার দুরবস্থার বিষয় সমস্ত জানাই, এক সপ্তাহ কাল মধ্যে একজন কর্ম্মচারী আমার আশ্রয়দাতার বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমাকে লইয়া যাইবার কারণ হেমচন্দ্রের ক্ষমতাপত্র দেখায়। আমার আশ্রয়দাতাও যত্নসহকারে আমাকে অনেক বুঝাইলেন যে, এমন মহৎ আশ্রয় পরিত্যাগ করা উচিত নয়; অতএব, সেই কর্ম্মচারীর সঙ্গে আমার যাত্রা করা উত্তম, এইরূপ বুঝাইয়া আমাকে তমলুকে পাঠান। হেমচন্দ্র আমাকে দেখিয়া যথেষ্ট আহ্লাদ প্রকাশ করেন ও আমাকে

তাঁর নিজ বাটীতে থাকিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। বিশেষ, হেমচন্দ্র বিবাহ না করায় বাড়ীতে স্ত্রীলোকের অভাব; তাতে ক'রেই অগত্যা তাঁহার সহ আমায় থাকিতে হইল। আর তিনি সুস্থ হইলে, আমার জ্ঞাতিগণের অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবেন, ইহারও আশ্বাস দেন। ছয় মাস তমলুকে থাকিয়া হেমচন্দ্র বর্দ্ধমান আসিবার উদ্যোগ করেন। দুই খানি বজ্‌রা ভাড়া করা হইল। শ্রাবণ মাসের ২০এ তারিখে আমরা তমলুক হইতে রওয়ানা হইলাম। ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির কারণ আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, ২১এ রোজ দুই প্রহরের সময় আমাদের বজ্‌রা দামোদরের মুখে প্রবেশ করিল। মাঝিদের মুখে শুনিলাম, যে দামোদর ও রূপনারায়ণের বাঁধ ভাসিয়া বহুসংখ্যক গ্রাম ডুবাইতে গিয়াছে আর এ ছাড়া গো মনুষ্য যে কত মরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

হেমচন্দ্র বজ্‌রার ভিতর বসিয়া সেতার বাজাইতেছিলেন, আমাদের বজরার মাঝির সঙ্গে অন্য গহনা-নৌকার মাঝির এই সব কথোপকথন শুনিয়া তিনি সেতার ছাড়িয়া উঠিলেন। আমাদের দুই খানি বজ্‌রা পাশাপাশি চলিতেছিল। হেমচন্দ্র যাহা করিতেছেন, তাহা আমি সমস্তই দেখিতে পাইতেছি। তিনি কি এক রকমের বৃষ্টি-নিবারক কাপড়ের জামা ও টুপী বাহির করিয়া গায়ে মাথায় দিলেন এবং সিন্দুক হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বাহির করিয়া বজরার ছাদের উপর গেলেন। সেই যন্ত্র দ্বারা কিয়ৎক্ষণ এ দিক্‌ ও দিক্‌ দেখিয়া দাঁড়িদের ও অন্যান্য চাকর এবং দরওয়ানদেরক হিলেন, "দেখ ঐ দূরে যে বন্যার জলের ঢেউ আসিতেছে, উহার মুখে অনেক মনুষ্যের দেহ দেখিতে পাইতেছি যে কেহ এক একটী জীবিত মনুষ্যকে বজ্‌রায় তুলিতে পারিবে,

প্রত্যেক ব্যক্তির কারণ আমি তাকে একশত করিয়া টাকা দিব, আত্মরক্ষার কারণ প্রত্যেকে এক একটী বাঁশের উপাধান লও।" এই বলিয়া দশ পনেরটী গোলাকার পদার্থ কামরার ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

দরওয়ান, চাকর, মাঝি সকলেই কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইল। পাছে ঢেউয়ের মুখে পড়িয়া বজ্‌রা উল্টাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় বজ্‌রা ফিরাইয়া নোঙ্গর করা হইল।

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার যন্ত্র দিয়া দেখিতেছেন। দুই চারি লহমার মধ্যে শত বজ্রের শব্দের ন্যায় একটা শব্দ শোনা গেল এবং পরক্ষণেই বজ্‌রা দুখানিকে আছড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড ঢেউ চলিয়া গেল। আমরা সকলেই ভিজিয়া গেলাম। নদীর জল চারিদিকে উথ্‌লাইয়া পড়িল। তার পর, শত শত গো মহিষ ছাগল কুকুর, নর নারীর দেহ ভাসমান দেখা গেল।

হেমচন্দ্র দৃঢ় হস্তে পালের এক গাছি দড়ি ধরিয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। নর নারীর ডুবু ডুবু দেহ দেখিয়াই হেমচন্দ্র কহিলেন ,"ধর।"

কিন্তু সেই তীরের ন্যায় বেগবান্ স্রোতের মুখে পড়িতে কাহারই সাহস হইল না। সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়াই করিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

হেমচন্দ্র ঈষৎ কোপযুক্ত, কিন্তু বজ্‌রার পার্শ্বে তীব্র তরঙ্গের টান দেখিয়াও কতকটা চিন্তা করিলেন। পরক্ষণে জলের ভিতর হইতে একটি রমণীর দেহ উপরে ভাষিয়া উঠিল। হাত দুটী যেন কিছু ধরিবার কারণ বাড়ানো। নদীর টান, তরঙ্গের শব্দ, নিজের বিপদ, সমস্তই হেমচন্দ্র ভুলিয়া গেলেন। সেই মুখ খানি দেখিয়া

হেমচন্দ্রের সকল বিবেচনা বিলুপ্ত হইল। তিনি শুদ্ধ "পিছনে ডিঙ্গি নিয়ে আয়।" এই কটী কথা বলিয়াই সেই তরঙ্গাকুলিত নদীর জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। লোক জনেরা চারিদিক্ হইতে হায়! হায়! করিয়া উঠিল।

হেমচন্দ্র পড়িবামাত্র ডুবিয়া গেলেন। চারিজন দাঁড়ীও তৎক্ষণাৎ বজ্‌রায় বাঁধা ডিঙ্গি ছাড়িয়া দিল।

সকলেই সেই স্রোতের দিকে চাহিয়া আছে। প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে গিয়া হেমচন্দ্র মাথা তুলিলেন। বজরার উপর হরি-ধ্বনি হইল।

মাথা তুলিয়াই হেমচন্দ্র চঞ্চল চক্ষে চতুর্দ্দিকে সেই রমণীর দেহ অনুসন্ধানে চাহিলেন। দশ হাত দূরে সেই রমণীর দেহ ভাসিয়া চলিয়াছে।

বাহুবলে সেই জল ভেদপূর্ব্বক ঐ রমণীর দেহ ধরিবার কারণ হেমচন্দ্র সাঁতার দিলেন। কিন্তু দুই চারি হাত থাকিতেই রমণী দেহ নিমগ্ন হইল। ডিঙ্গিবাহকেরা "বাবু নিরস্ত হউন। বাবু নিরস্ত হউন"! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হেমচন্দ্র সেই দেহের সঙ্গে ডুবিলেন। ডিঙ্গির মাঝিরা "সর্ব্বনাশ হইল! মড়া তলিয়েছে, বাবুও মারা গেলেন"! ইত্যাদি বলিয়া হায় হুতাশ করিয়া উঠিল।

ডিঙ্গিও বাহকদের বল অতিক্রম করিয়া নিম্নদিকে অল্পে অল্পে বাহিয়া চলিল। আমরা সকলেই সজল চক্ষে জলের উপর চাহিয়া আছি, এমন সময়, পুনর্ব্বার হেমচন্দ্র ভাসিয়া উপরে উঠিলেন।

কিন্তু এবার তিনি দুর্ব্বল হইয়াছেন, আর তাঁর বাহুতে

তেজ নাই ; বোধ হয়, তিনি অল্পকালের মধ্যে আবার ডুবিয়া যাইবেন। তিনি এক হাত দিয়া ডিঙ্গিওয়ালাদের নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। অন্য হাতে যেন একটা কি ধরিয়া স্রোতে গা ভাসান দিয়া চলিয়াছেন, বাহকেরা প্রাণপণে ডিঙ্গি বাহিয়া নিকটে লইয়া গেলে, ধরাধরি করিয়া অগ্রে একটী রমণীর দেহ উঠাইলেন ও কিছু পরে বাবু আপনিও উঠিলেন।

বজ্‌রাময় আনন্দ ধ্বনি উঠিল।

ডিঙ্গি প্রতিকূলে বাহিয়া আনা অসম্ভব দেখিয়া বজ্‌রা নোঙ্গর তুলিয়া খুলিয়া দিল এবং অল্প সময় মধ্যে ডিঙ্গির সহ মিলিত হইল।

চাকরদের সাহায্যে বজরার কামরার মধ্যে ঐ অচৈতন্য রমণীর দেহ আনীত হইল। হেমচন্দ্র নিজে তার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

বামাঠাকুরুণ এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আমার হৃদয় সহস্র প্রকার ভাবমালায় সমাকুলিত হইয়াছিল।

আমি বলিলাম, তার পর ঠাক্‌রুণ ? তার পর বামাঠাক্‌রুন বলিলেন, বজরা একত্রিত হইয়া পুনর্ব্বার চলিতে লাগিল।

হেমচন্দ্র আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঐ রূপবতী কামিনীর চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন আমাকে ডাকিযা বলিলেন. মাসি ! যাহাকে রক্ষা করিবার কারণ আমি প্রচণ্ড বেগবান্ তরঙ্গাকুলিত দামোদরের বন্যার জলে ডুবিয়াছিলাম, তাহাকে যদ্যপি এই ভয়ঙ্কর পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার আর

ক্ষোভ রাখিবার জায়গা থাকিবে না। দুই তিন রাত হেমচন্দ্র নিদ্রা যান নাই। না খাইয়া ও না ঘুমাইয়া তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

আমার স্বামী ডাক্তারী জানিতেন; এই জন্য, আমাকেও কিছু কিছু শিখাইয়াছিলেন। আমি হেমচন্দ্রকে কহিলাম, বাবা! অনাহারে অনিদ্রায় আর এই বজ্‌রার কামরার মধ্যে থাকিয়া তোমার শরীর বড় কাহিল হইয়াছে, তুমি আজ খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়ন করগে, আমি রোগীকে সমস্ত রাত্রি লইয়া জাগিয়া থাকিব। আমিও কিছু কিছু চিকিৎসা করিতে জানি।

হেমচন্দ্র আমার কথা শ্রুতমাত্র যথেষ্ট আনন্দিত হইলেন, তিনি বলিলেন, 'মাসি! জলে কুড়নো অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী ব'লে যেন বিন্দুমাত্র অযত্ন ক'রো না; আমাকে যেরূপ ভাবেন, একেও সেই রূপ ভাবিবেন। আর যদি কোন বিষয় জানবার আবশ্যক হয়, আমায় জাগাইতে ক্রুটী করিবেন না।'

এই বলিয়া হেমচন্দ্র শয়নকক্ষে গেলেন। আমি সেই রূপবতী রমণীকে কোলে করিয়া রজনী কাটাইলাম।

প্রভাতে উঠিয়াই হেমচন্দ্র রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিলেন এবং কিছু বিমর্ষ হইয়া কহিলেন' 'মাসি। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, জলের উপর থাকিলে যুবতী শীঘ্র সুস্থতা লাভ করিবেন; কিন্তু আজ তার বিপরীত দেখিতেছি যাই হ'ক, আর এ স্থানে থাকা উচিত নয়, আজই বর্দ্ধমান যাওয়া আবশ্যক।'

এই বলিয়াই তিনি বাহিরে যাইয়া নোঙ্গর তুলিতে আদেশ দিলেন।

মাঝিরা ধরাধরি করিয়া নোঙ্গর তুলিয়া দাঁড়ে বসিল এবং যথাসাধ্য প্রাণপণে স্রোতের প্রতিকূলে বাহিয়া সন্ধ্যার সময় কাটগোলার ঘাটে আসিয়া বজ্‌রা বাঁধিল। চাকরেরা দ্রুতপদে ডাঙ্গায় নামিয়া কাঞ্চন নগর হইতে শিবিকা আনিয়া উপস্থিত করিল। অন্যান্য দাসীরা গো-শকটে উঠিল, আমি ও হেমচন্দ্র দুইখানি পাল্কিতে উঠিলাম। যুবতীকেও একখানি শিবিকাতে উঠান হইল। আমরা সকলে হেমচন্দ্রের বাগানবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরদিন প্রাতে ইংরাজ ডাক্তার প্রতিদিন একশত টাকা বেতনে যুবতীর চিকিৎসার কারণ নিযুক্ত হইল। ইংরাজ চিকিৎসকের সুচিকিৎসায়ে সতোর দিনের পরে সেই যুবতীর চৈতন্য হইল। এ সতের রাত্রি হেমচন্দ্র জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। সতের দিনের পর যুবতীর সংজ্ঞা হইল। আজ উনিশ দিন। যুবতী আজ উঠিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার জীবনরক্ষককে দেখিয়াছেন। যুবতী এখন আমার সামনে দাঁড়াইয়া তাঁর উদ্ধারের বৃত্তান্ত শুনিতেছেন, যুবতীর নাম সুরবালা, যুবতী বড় দুষ্ট ; কারণ, আমার হেমচন্দ্রকে এক কালে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে। এই বলিয়া বামাঠাকুরুণ আমার দুই গণ্ডদেশ চুম্বন করিয়া বাহিরে গেলেন।

* * * * *

বামাঠাকুরুণ চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু যাইবার সময় প্রস্তর নির্ম্মিত মেজের উপর কি যেন রাখিয়া গেলেন।

আমি উঠিয়া মেজের নিকটে যাইলাম। দেখিলাম যে, একটা একহাত পরিমাণ হাতীর দাঁতের বাক্স, তার উপর, কল খুলিবার একটী চাবি।

আমি একবার ভাবিলাম, বাক্স খোলা আমার উচিত কি না, বামাঠাক্রুণ যদি ভুলিয়াই রাখিয়া গিয়া থাকেন, তার পর ভাবিলাম, দেখিলেই বা হানি কি? দেখিলেত আর উড়িয়া যাইবে না। চাবি লাগাইয়া বাক্সটী খুলিলাম। দেখিলাম, ভিতরের বস্তুগুলি একখানি লাল মকমলে ঢাকা, তার উপর পীত-বর্ণের রেশমে লেখা আছে,—

"অনুগত জনের উপহার।"

বাক্সটীর ডালা আমার হস্ত হইতে পড়িয়া গেল।

আমি বড় ভাবনায় পড়িলাম।

কে কার অনুগত? কে কাকে উপহার দেয়?

আমারই বা উপহারে স্বত্ব কি? মনে ভাবিলাম যে, উপ-হারটি কি, একবার দেখাই যাক না।

আবার বাক্সের ডালা খুলিলাম, মকমলের আবরণটীও সরাইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষু ঝলসাইয়া গেল। নক্ষত্র যেন চোখের উপর ঝিকিমিকি করিয়া উঠিল।

সে সব অলঙ্কার আমি কখন চক্ষে দেখি নাই।

বালা, চুড়ি, বাজু, তাবিজ, অনন্ত, জশম, চিক, সাতনরী, মুক্তার হার, কাণবালা, চৌদানী, ফুল, চিরুণী, গোট, চন্দ্রহার, আংটী, পাঁজোর, আর আর কত কি যে, সকলের নামও জানি না; কি ক'রে কোথায় পরে, তাও জানি না।

সকলের নীচে একখানি মুক্তার ফ্রেমে বসান একটী যুবা পুরুষের চিত্র, হীরা মুক্তা চুনি পান্না ও স্বর্ণ প্রভৃতি সকলের জ্যোতি আমার চক্ষে স্তিমিত হইয়া গেল।

গহনা গুলিকে পূর্ব্বের ন্যায় সাজাইয়া বাক্সটীতে বন্ধ করিলাম। যেখানের চাবি, সেই খানে রাখিয়া দিলাম। সেই চিত্র খানি একবার মস্তকে রাখিলাম, একবার হৃদয়ে ধরিলাম।

আবার জিব কাটিলাম।

হেমচন্দ্র আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে সহস্র বার মাথায় রাখিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে হঠাৎ হৃদয়ে ধরিলাম কেন?

তাঁহার চিত্র স্পর্শে হৃদয় শীতল হইল বটে, কিন্তু—

চিত্রপটখানি হৃদয়ে করিয়া সেই দিন রাত্রে নিদ্রা গেলেম।

হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে রাখিব না, তো কোথায় রাখিব?

নির্জ্জনে—প্রেমভিক্ষা।

যে দিন বামাঠাকুরুণের সহিত আমার কথোপকথন হয়, তার পর সপ্তাহ কাল অতীত হইয়াছে।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছি; শরীরে উত্তম বল পাইয়াছি। আজ কাল আর শুধু ঘরের ভিতর বসে থাকি না, পুস্তক পাঠের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, হেমচন্দ্র কলিকাতা হইতে কত পুস্তক আনাইয়া দিয়াছেন। আমার আজ কাল আর কোন বস্তুর অভাব নাই, একবার মুখ ফুটিয়া বলিলেই তখনি যেন ভূতে আনিয়া দেয়। যে সকল খাদ্য সামগ্রী কখনও খাই নাই, সে সকল আমার নিত্য আহার, যে সকল দ্রব্যাদি কখন দেখি নাই, সে সকল আমার নিত্য ব্যবহার। কোন বিষয়ের কারণই আমার চিন্তা করিতে হয় না। শুদ্ধ একটী চিন্তা, যদিও এক্ষণে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি, তত্রাচ এক

দিনের কারণ হেমচন্দ্র আমার নিকটে আসেন নাই। প্রত্যহই মনে করি, বামাঠাকুরুণকে দিয়ে ব'লে পাঠাব ; কিন্তু বল্‌বার আর সময় পেয়ে উঠি না। আবার তার উপর বামাঠাকুরুণের মুখের সেই ঈষৎ হাসির ভঙ্গীটুকু দেখ্‌লে, আরো কেমন লজ্জা লজ্জা করে। এমনি ক'রে আট দশ দিনের ভিতরও কিছু বলাই হ'লো না।

আজি পূর্ণিমা তিথি। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে গৃহমধ্যে অবস্থান করা মহা কষ্টজনক হওয়ায় আমি সন্ধ্যার সময় বাগানে নামিলাম। আজ কাল বৈকালে প্রায় আমি তিন চারি ঘণ্টা করিয়া বেড়াইয়া থাকি। বাগানের সকল স্থান এক্ষণে আমার পরিচিত হইয়াছে, অন্ধকারেও কোন স্থানে যাইতে আর আমার কষ্ট হয় না ; আমি দুপুর রাত্রেও সকল স্থান বেড়াইতে পারি।

আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে উদ্যানের সকল স্থান প্রায় দিবসের ন্যায় দেখা যাচ্ছে। যূঁই, বেল, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পের সৌরভে উদ্যান আমোদিত।

আমি কেয়ারির মধ্যে একখানি প্রস্তরাসনে বসিলাম। স্থানটী নির্জ্জন। আমি একলা শুধু চাঁদটী আমার সাথী, কিন্তু চাঁদ কথা কয় না, এই চাঁদের দোষ। চাঁদ দেখে শোনে, মেঘের আড়ালে থেকে লুকোচুরি খে'লে, কিন্তু কথা কয় না। আমার একজন কথা কবার লোক চাই। চাঁদ কথা কইলে না তো ফুলের দিকে চাইলুম, তারা সকলেই হাস্‌ছে—মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌ছে, মাথা নাড়্‌ছে, হেল্‌ছে, দুল্‌ছে, কই তারাও কথা কইলে না।

গোটা দুই বাদুড় ফলের গাছ থেকে "আস্‌চে"! "আস্‌চে"! ক'রে আর এক গাছে গিয়ে বস্‌চে,! কেউই কথার দোসর হ'লো না। একটা লক্ষ্মী পেঁচা "ঐ! ঐ"! করে সাম্‌নে দিয়ে উড়ে গেল, কেউ কথা কইলে না। বড্ডই রাগ হ'লো। সকলের চেয়ে চাঁদের উপরেই বেশী রাগ হ'লো। মনে কল্লুম যে, আমার চাঁদ আমার কাছে থাক্‌লে তো দেখ্‌তুম যে, তার কলঙ্ক নাই। কর মুষ্টিবদ্ধ ক'রে চাঁদকে দেখালুম, যে তোমায় দেখ্‌বো! আস্তে বল্লুম, "হেমচন্দ্র!" বলেই জীব কাট্‌লুম।

সহসা আমার নিকটস্থ বৃক্ষের ঝোপটী মর্ মর্ শব্দ করিয়া উঠিল। আমি চমকাইয়া উঠিলাম। চঞ্চলচক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। পরক্ষণেই যাঁকে আমি শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে দেখিয়া থাকি, যাঁর সাক্ষাৎ আশায় আর সকলই তিক্ত লাগে, যাঁহার চিত্রপট আমি হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছি, যিনি নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াও আমাকে বন্যার জল হইতে বাঁচাইয়াছেন, যিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নিজে অনশনে অনিদ্রায় কালাতিপাত করিয়া আমার সেবা করিয়াছেন, সেই সর্ব্বগুণধর হেমচন্দ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত।

সেই প্রশান্ত মুখশ্রী, সেই শান্তিময়ী দৃষ্টি, সেই সুমধুর হাসি! প্রথমে আমার ইচ্ছা হইল যে, আমি তাঁর পদতলে পড়িয়া তাঁর সহস্র উপকারের কারণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। সেই আশায় উঠিলাম। কিন্তু যুবতী স্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়া আমার সকল কাজে বিঘ্ন হইল। যাঁহার মুখ দেখিবার কারণ নয়ন এত ব্যস্ত, যাঁর মধুমাখা কথা শুনিবার জন্য কর্ণ অতৃপ্ত, যাঁকে হৃদয়ে ধারণ করিবার কারণ প্রাণ এত আকুল, সেই হেমচন্দ্র সম্মুখীন

হইবামাত্র নয়ন নিমীলিত হইল, বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কত কি বল্‌বো মনে করেছিলুম, কিন্তু একটা কথাও মুখে এলো না। হাবা বোবার ন্যায় মুখ হেঁট ক'রে বড়াই বুড়ীর মত সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে, আমি তাঁর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রৈলেম।

হেমচন্দ্র বড় চতুর। তিনি বোধ হয়, আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি মৃদু মধুস্বরে কহিলেন, "সুরবালা! তুমি আমায় ডাকিয়াছ? আমি তোমার সমক্ষে উপস্থিত। আমার প্রতি কি আদেশ আছে, প্রকাশ কর, আমি এখনি প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি।"

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর আমি কখন শুনি নাই। আজ সবেমাত্র শুনিলাম। আমার কর্ণকুহরে যেন অমৃতের ধারা ঢালিয়া দিল। আমার সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত ও কদলীপত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমার কম্পান্বিত কলেবর দৃষ্টিপূর্ব্বক হেমচন্দ্র সস্নেহে বলিলেন, "সুরবালা! দাঁড়াইয়া থাকিতে তোমার কষ্ট বোধ হয় উপবেশন কর।"

এই বলিয়া তিনি আমার মুখের দিকে ঈষৎ বক্রদৃষ্টি করিলেন।

আমি দ্বিতীয় কথা না কহিয়া সেই প্রস্তরাসনের উপর বসিয়া পড়িলাম। আর কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে, বোধ হয় আমি পড়িয়া যাইতাম।

হেমচন্দ্র কেয়ারির একটী বেড়ার উপর হস্ত রাখিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময়ের মধ্যে মনের সঙ্গে আমার একটু ছোট মোট ঝগড়া হইয়া গেল। মন বলিল, "কথা কনা লো ছুঁড়ি?"

আমি বলিলাম, "আমি কথা কই, বা না কই, তোর তাতে ব'য়ে গেলো কি ?"

মন বলিল, "হ্যাঁলা কালামুখি! যে তোর এত ক'রেছে, তুমি মুখপুড়ি, বুঝি তার সঙ্গে সেধে কথা কইতে পার না ?"

আমি বলিলাম, "আমার ব'য়ে গেছে ?"

মন বলিল, তবে তোর বাজী হার, আমায় লাক টাকা দে।

আমি বলিলাম, "তোকে ঘোড়ার ডিম্ দোবো, আমি তো ও বাজী রাখিনি। হেমচন্দ্র আমাকে দিন রাত ভাব্‌বে, এই বাজী রেখেছি।"

মন বলিল, "তবে তুই মরে যা!"

মনেতে আমাতে একটু মিল হ'লো।

এমন সময় হেমচন্দ্র আবার বলিলেন, "সুরবালার অলঙ্কারহীন অঙ্গ দেখে কার মনে কষ্ট হ'চ্ছে। উপহার বোধ হয়, সুরবালার মনে ধরে নাই।"

এইবার চতুর হেমচন্দ্র মর্ম্মস্থানে আঘাত করিয়াছেন।

আর কথা না কহিলে, হেমচন্দ্র মনে দুঃখ পাইবেন। যিনি নিজ অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, আমার ন্যায় একজন সামান্য রমণীর জীবন রক্ষা করিতে ত্রুটী করেন নাই, সেই হেমচন্দ্র আমায় নিতান্ত কৃতঘ্ন মনে করিবেন। আর থাকিতে পারিলাম না। গায়ের জামা উন্মোচন করিয়া হেমচন্দ্রের চিত্রখানি বক্ষঃস্থল হইতে বাহির করিলাম। একবার মাত্র মস্তকে ধরিয়া সেইখানি হেমচন্দ্রের হাতে দিয়া, কম্পিতস্বরে কহিলাম, "উপ-

হারের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই হতভাগিনী অঙ্গে ধারণ করিয়াছে।

হেমচন্দ্র চকিতের ন্যায় তাঁহার নিজ চিত্র খানির প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টি করিলেন এবং পরক্ষণেই জানু অবনতপূর্ব্বক আমার পা দুই খানি তুলিয়া আপনার বক্ষে ধারণ করিলেন!!!

হেমচন্দ্রের সুশীতল করস্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আমার দেহের প্রত্যেক শিরায় শিরায় বিদ্যুদাগ্নি ছুটিল। আমি অপূর্ব্ব ভাবের অধীন হইয়া চক্ষু মুদিলাম। আমার সমস্ত দেহ শিথিল হইয়া পড়িল।

পরক্ষণে আমার সুখসুষুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হইল। আমার প্রাণদাতা, আমার অর্চ্চনীয় দেবতা, আমার পদতলে! ছি! ছি! আমি কি লজ্জাহীনা! আমি কি পাপীয়সী! যে যার পদধৌত করিয়া প্রত্যহ খাইলে, তাঁর ঋণ পরিশোধ হইবার নহে, আমরণ কাল দাসীত্ব করিলে, যাঁর এক দিনের উপকারের প্রতিশোধ দেওয়া অসম্ভব, সেই হেমচন্দ্র, সেই বিপ্রকুলশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বগুণধর পরম রূপবান্, অতুল ধনশালী হেমচন্দ্র, আমার পা বক্ষে ধরিয়াছেন! আর আমি চুপ করিয়া রহিয়াছি।

হেমচন্দ্রের হস্ত হইতে পা ছাড়াইয়া আমি বিদ্যুদ্গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সর্ব্বনাশ! করিলেন কি! এ জন্মে এই ঘটিয়াছে, আবার পর জন্মে কি আরো দুঃখের সাগরে নিমগ্ন হইব! এ পাপের কি আমার প্রায়শ্চিত্ত আছে? আপনি আমার পূজনীয় হইয়া কিরূপে এমন অন্যায় কার্য্য করি[illegible] পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিলেন? যাঁর ঋণ বোধ [illegible] পরি-

শোধ করিতে পারিব না, যিনি এ জন্মের মত আমায় অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন, আমার প্রতি তাঁর কি এরূপ করা উচিত ?

হেমচন্দ্র ইষদ্‌হাস্যে কহিলেন, "ও সকল কথা কহিলে, অনুগতজনকে আর দেখিতে পাইবে না, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা সকল ভদ্র লোকেই করিয়া থাকে। এক ব্যক্তিকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যাঁর দেহে কিছুমাত্র দয়াধর্ম্ম আছে, তিনিই প্রাণ দেন, তাতে তো তোমার বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা।"

হেমচন্দ্রের কথাগুলি বড় মিষ্ট লাগিল। আমার পক্ষে স্বতন্ত্রটা কি ? শুনিবার কারণ মৃদু ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার বিষয়ে স্বতন্ত্র কি ? হেমচন্দ্র উৎসাহের সহিত কহিলেন, "সুরবালার মত সুন্দরী রমণী-রত্ন পৃথিবীতে কয়টি আছে। যদিও কোথাও থাকে তো এই হেমচন্দ্রের চক্ষে তো সেরূপ বোধ হয় নাই। যা'র বহুমূল্যবান্ রত্ন লাভের বাঞ্ছা থাকে, সেই বারিধির অতলস্পর্শ গহ্বরে নিমগ্ন হয়, যার গোলাপ পুষ্পে অনুরাগ জন্মে, সেই তার কাঁটার আঘাত সহ্য কর্‌তে পারে। দেবতারা সমুদ্র মন্থন ক'রে তবে সুধাপান কোত্তে পেয়েছিলেন। তোমার ন্যায় সুন্দরীকুল-ভূষণা রমণীকে রক্ষা কর্‌তে আমার ন্যায় সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাণ দিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হয় না।"

বলিতে বলিতে হেমচন্দ্রের নয়ন বিস্ফারিত, দেহ উৎসাহিত ও প্রলম্বমান্ মুখমণ্ডল নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন আমি দুষ্ট চাঁদের দিকে চেয়ে মনে মনে করিলাম, কেমন ! বড় যে গুমরে তখন কথা কও নি ! এখন আমার চাঁদকে দেখে বুঝি লজ্জায় মেঘের আড়ালে লুকাবার চেষ্টা কর্‌চো ?

হেমচন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, "সুরবালা! একটী কথা বলিবে কি?"

আমি কহিলাম, আপনাকে একটী কথা বলিব, ইহাও কি আমায় জিজ্ঞাসা করিতে হয়? কি বলিতে হইবে বলুন, এখনি বলিতেছি।

হেমচন্দ্র। "সুরবালা! আমার বিপুল অর্থ আছে, আমার চক্ষে আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও রূপসী জ্ঞান হয় নাই বলিয়া, বিবাহ করি নাই। এক্ষণে আমার মন তোমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছে। তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কি?"

কি ঘৃণার কথা মা! আমি বিধবা, আমি আবার বিবাহ করিব কি! কথাটায় রাগ হলো, একটু হাসিও এলো। একবার মনে করিলাম, হেমচন্দ্রের গাল দুটী টিপিয়া দি; কিন্তু লজ্জায় সেটা হ'লো না।

হেমচন্দ্র পুনশ্চ কহিলেন, "সুরবালা! আমি তোমার পূর্ব্বের বিষয় কোন সূত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি; কিন্তু যদ্যপি কোন উপায় থাকে, তা হলে তুমি আমারই কি না?"

আমি কহিলাম, আমি তোমারই।

হেমচন্দ্র পুনশ্চ কহিলেন, "তুমি আমারই?"

আমি কহিলাম, আমি তোমারই।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "তুমি আমারই"

আমি কহিলাম, আমি তোমারই।

পরক্ষণেই চাঁদের উপরে একখানি মেঘ ঢাকা পড়িল। বর-বধূর উপর যেন প্রথম শুভদৃষ্টি কালে লজ্জা-বসনের আবরণ দেওয়া হ'ল। হেমচন্দ্র উঠিলেন। নিজের হস্ত হইতে একটী অঙ্গু-

রীয় খুলিয়া আমার বাম হস্তে আপনি পরাইয়া দিলেন এবং তার পর, তাঁর প্রশস্ত স্নিগ্ধ বক্ষে মাথা রাখিয়া আমি নয়ন নিমীলিত করিলাম। তাঁর বাহু দুটী ক্ষণকালের কারণ আমার কটিদেশটা বেষ্টন করিয়া ধরিল। হেমচন্দ্র বারেক মাত্র আমায় সবলে বক্ষে টানিয়া ধরিলেন। পরক্ষণেই তিনি দ্রুত পদে ফুলের কেয়ারির মধ্য দিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে গেলেন। কেবল তাঁহার উষ্ণ শ্বাস আমার ললাটের উপর পড়িয়াছে, অনুভব হইতে লাগিল।

পুনর্ব্বার চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাগুলিও যেন চক্ষু ঠারিয়া আমায় "কেমন গো? কেমন আছ?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

আমি লজ্জায় নতমুখী হইয়া যে কতক্ষণ হেমচন্দ্রের মুখখানি ভাবিতে লাগিলাম, তা জানি না। হঠাৎ আমার পিঠের উপর যেন কে হাত দিয়ে কহিল, "বলি হ্যাঁ গা! আজ আর কি খাওয়া দাওয়া হবে না?" আমি ফিরিয়া দেখিলাম, বামাঠাকুরুণের শুষ্ক সেই বক্রহাসি মুখখানি।

উপরে চাহিয়া দেখিলাম, চন্দ্র মধ্য গগনে পূর্ণ মূর্ত্তিতে সুশীতল কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। আমি নীরবে বামাঠাকুরুণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

অজ্ঞাতপত্র—ভিখারিণী।

পরদিন প্রত্যূষে স্নানান্তে আমি বেশগৃহে একখানি কেদারার উপর বসিয়া আছি। বাতায়নের মধ্য দিয়া গৃহে সূর্য্যরশ্মি পড়িয়াছে। সেই রৌদ্রে দুইজন পরিচারিকা আমার কেশ শুকাইয়া দিতেছে।

আমি একমনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হেমচন্দ্র কলিকাতা হইতে অনেক টাকার পুস্তক আনাইয়া দিয়াছেন। আমার এক্ষণে লেখা পড়াতেই সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। বাড়ীতে অনেক কাজ করিতে হইত; কিন্তু এখানে তার নাম গন্ধও নাই। হেমচন্দ্রের যত্নে আমার সুখের সীমা নাই। বিশেষতঃ বামাঠাকুরুণ ও অন্যান্য পরিচারিকাগণ সকলেই আমাকে অধিকতর সম্মান করিতে লাগিল।

চুল শুকান হইল। পরিচারিণীরা অন্যান্য কার্য্যে চলিয়া গেল। আমি তথাপি পুস্তক পাঠে নিমগ্ন আছি, হঠাৎ আমার সম্মুখে উপরের ঝাড় হইতে দুইটী কলম ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া পড়িল।

আমি উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, ঝাড়টী দুলিতেছে। গৃহ মধ্যে ঝড় নাই বাতাস নাই, অথচ ঝাড়টীকে দুলিতে দেখিয়া, আমি ভূমিকম্প হইতেছে, এই আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিকে চাহিলাম, আর কিছুই দুলিতেছে না। তখন আমার সন্দেহ হইল। আমি ঝাড়টীর প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টি করায় দেখিলাম যে তীরের ন্যায় একটা দুই হাত লৌহশলাকার মুখে একখানি পত্র ঝুলিতেছে এবং তীরটি যে ভাবে পড়িয়াছে, তাহাতে বুঝিলাম যে, ঐটা কোন স্থান হইতে তীব্র তেজে আসিয়া লাগায়, ঝাড়ের দুটী কলম খুলিয়া গিয়াছে।

ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া চিন্তা করিলাম। বুঝিলাম যে, শর নিক্ষেপের একমাত্র উদ্দেশ্য পত্র প্রেরণ। কিন্তু কে এ পত্র প্রেরণ করিল? আমার পত্রখানি দেখিবার কারণ ঔৎসুক্য বাড়িল, একখানি কেদারার উপর উঠিয়া আমি শরসংলগ্ন পত্রখানি পাড়িলাম।

পত্র খানি কৌশলে উহাতে বদ্ধ হইয়াছে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম।

পত্রখানিতে কোন সুগন্ধি দ্রব্য লাগান ছুঁইবামাত্র এক প্রকার সৌগন্ধ নির্গত হইতে লাগিল। পত্রখানি লৌহশলাকায় যে সূত্রে বাঁধা ছিল, তাহা খুলিলাম। পত্রখানি আমার পাঠ করা উচিত কি না, তাহা আমি দুই তিনবার ভাবিলাম। পত্র পাঠ করিলে, আমার উপর হেমচন্দ্র যদ্যপি রাগ করেন? কেনই বা তাই করিবেন? যদি কোন দূষ্য পত্র হয়, তখনি হেমচন্দ্রকে দিব; পড়িতে বাধা কি?

তত্রাচ মনে কেমন একটা সন্দেহ হইতে লাগিল। দক্ষিণ হস্তে পত্রের খামখানির এক ধার ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

পত্রের ভিতরটী আরো সুগন্ধি দ্রব্যে পূর্ণ। পত্রের নিম্নভাগে কাহারও নাম স্বাক্ষর নাই। পত্রখানি উত্তম স্পষ্টাক্ষরে লেখা।

পত্র।

"সুরবালা!

বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিলাম যে, তুমি জলমগ্ন হইতে রক্ষিত হইয়াছ; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যে আমি কত দোষী, তাহা বলিতে পারি না; কেন না, তোমাকে জল হইতে রক্ষা করা যদ্যপি হেমচন্দ্রের না হইয়া আমার দ্বারা হইত, তাহা হইলে, বোধ হয় আমার আজ আনন্দের সীমা থাকিত না।

কিন্তু কি করিব, "সাগর সিঞ্চিত মাণিক" হেমচন্দ্রের ভাগ্যে পড়িয়াছে, পড়ুক; কিন্তু হেমচন্দ্র তাহা পাইবার উপযুক্ত নহে। কেন না, যে হেমচন্দ্রকে তুমি সরলতার আদর্শ মনে করিতেছ,

সে হেমচন্দ্র যে কি, তা তুমি অচিরেই জানিতে পারিবে। সুন্দরি! তুমি যে নরসুন্দরী নও, সুরসুন্দরী আমি ভালরূপে দেখিয়াছি।”

এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া আমার রাগে শরীর কাঁপিতে লাগিল। একবার মনে করিলাম পত্র ছিঁড়িয়া ফেলি। কিন্তু হেমচন্দ্রকে না দেখাইয়া ছেঁড়া উচিত নয়। ভাবিলাম, শেষটুকু পড়ি না।

“হেমচন্দ্রের অপেক্ষা আমার প্রচুর অর্থ আছে, আমি তোমাকে অতি যত্নে সর্ব্বস্ব দিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। যদ্যপি তোমার তাহা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, সাতিশয় সুখী হইবে; আর যদ্যপি হেমচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া অন্যরূপ কর, তাহা হইলে সুন্দরি! দাসকে ক্ষমা করিও, যে কোন উপায়ে পারি, তোমাকে আপনার করিব; সে বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবে। এইমাত্র আমার ভিক্ষা ইতি—১৭ই ভাদ্র।”

আমি তোমারই।

পত্রখানি কম্পিত হস্তে খামের ভিতর পুরিয়া মেজের উপর রাখিয়া ক্ষণকাল কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। যে পর্য্যন্ত আমাকে বর্দ্ধমানে আনা হইয়াছে, সেই পর্য্যন্তই তো আমি এই গৃহেই আছি, বেড়াইবার মধ্যে বাগান, তাহাও এরূপ উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা যে, কোন দিক্ দিয়েও কারও প্রবেশ সম্ভব নাই। তবে কে আমাকে কি প্রকারে দেখিল?

পত্রে স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে যে, লেখক কোন ধনী ব্যক্তি এবং সে আমার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে এবং শেষে এতদূর বলি-

য়াছে যে, স্ব ইচ্ছায় স্বীকার না করিলে, বল প্রকাশ করিয়া নিজ অভিষ্ট সিদ্ধ করিবে।

আর সহ্য হইল না। দাঁড়াইয়াই ঘণ্টার দড়িতে হাত দিলাম। তখন আমার শরীর রাগে ফুলিতেছিল, সেই জন্য আমি এত জোরে ঘণ্টার দড়ি টানিয়াছিলাম যে, বাড়ীময় ঘণ্টার আওয়াজ হইয়া উঠিল। ঠুং ঠুং শব্দ শুনে চারিদিক্ হ'তে পরিচারিণীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল। আমার এলো চুল বিস্ফারিত চক্ষু, রক্তবর্ণ গণ্ডদেশ, আন্দোলিত হৃদয়, কেদারার উপর এক পা, দেখিয়াই দাসীরা অবাক্ হইয়া গেল। কেহ সাহস করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। কাষ্ঠের পুতুলের মত সকলে মুগ্ধ হইয়া রহিল। রাগে কিয়ৎকাল আমারও মুখে কথা আইসে নাই। বাক্‌শক্তি পাইয়াই রুদ্ধ স্বরে কহিলাম, শীঘ্র কর্ত্তাকে ডাকিয়া দেও, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দাসীরা ঊর্দ্ধশ্বাসে হেমচন্দ্রকে ডাকিতে ছুটিল।

হেমচন্দ্র আমাকে ঐ সমস্ত ঘর ছাড়িয়া দিয়া আপনি অন্য এক খণ্ডে থাকেন। দুই তিন দিন অন্তর তিনি আমার সঙ্গে বৈকালে দুই এক ঘণ্টার কারণ দেখা করিতে আসেন।

আমি পুনর্ব্বার বসিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ত্রস্তভাবে গৃহের বহির্ভাগে পদশব্দ হইল। কয়েকটী দরজাই রুদ্ধ ছিল, দ্বারে করাঘাত হইল। আমি বুঝিলাম যে, হেমচন্দ্র আসিয়াছেন।

আমি তাঁহার পদশব্দ উত্তম বুঝি।

আমি বলিলাম, আইস।

হেমচন্দ্র পরক্ষণে গৃহপ্রবেশ করিলেই মেঘের আড়াল হইতে পূর্ণচন্দ্র বাহির হইলে, যেমন অন্ধকারময় স্থান সহসা আলোকিত

হইয়া পথিকের ভয় বিনাশ করে, হেমচন্দ্রের সেই হাসি হাসি, সরল, ভাবমাখা মুখখানি দেখিবামাত্র আমার মনের দুর্ভাবনা দূর হইয়া গেল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

হেমচন্দ্র বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আজ যে বড় জোর তলব?" আমিও সমস্বরে কহিলাম, "হাজির থাকিলে তো তলবের আবশ্যক হয় না।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "কেন শ্রীচরণে তো আছিই।"

আমি অপরুদ্ধ হইয়া কহিলাম, ওরূপ কথা বলিলে আপনার উপর রাগ করিব।

হেম। পায়ে ধরা আমার এক রকম অভ্যাস হয়েছে।

আমি। আপনি কি এই ঘরে একটী হরিণী পুষিয়াছেন?

হেম। আকর্ণ বিস্তারিত চক্ষু দেখিয়া তাই বোধ হয় বটে।

আমি। ঠাট্টা নয়, ঠিক্ বলুন।

হেম। ভাব বুঝিলেই বলিব।

আমি। আমি যদি হরিণী নই, তবে বাহির হইতে তীরে আসে কেন?

হেমচন্দ্র কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

আমি সেই লোহার শলাকাটী হস্তে করিয়া মেজের উপরিস্থিত পত্রখানি দেখাইয়া কহিলাম, তীরের সাহায্যে এই খানি গৃহ মধ্যে আসিয়াছে, পড়িয়া দেখুন।

চকিতের মধ্যে হেমচন্দ্র পত্র উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমিও তাঁর মনের ভাব বুঝিবার কারণ তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

হেমচন্দ্রের প্রথমে পত্র খুলিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। প্রথম দুই চারি পংক্তি পড়িতে না পড়িতে তাঁর মুখ-মণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সরল মুখমণ্ডল এককালেই পাংশুবৎ হইল।

কম্পিত হস্তে হেমচন্দ্র পত্রখানি পাঠ করিয়া আমার প্রতি কহিলেন, "সুরবালা! তুমি এ খানি সমস্ত পড়িয়াছ?"

এই কথা বলিতে বলিতে যেন হেমচন্দ্রের মাথা ঘূরিয়া উঠিল, তিনি মাতালের ন্যায় চলিয়া গেলেন। নিশ্চয়ই মেজের উপর পড়িতেন, কিন্তু একখানি লোহার পেঁচের দাণ্ডা ধরিয়া সামলাইলেন।

আমি দৌড়িয়া তাঁহার নিকট গেলাম ও তাঁহার হস্ত ধরিয়া খাটের উপর বসাইলাম। কাচ আবৃত আলমারি হইতে গোলাব জলের পাত্র বাহির করিয়া তাঁহার মাথায় ও চক্ষে বারম্বার দিলাম, তাহাতে যেন তাঁহার দেহ কতকটা সুস্থ হইল। আমি বলিলাম, আপনার কি কোন বিশেষ অসুখ বোধ হইতেছে? আর কাহাকেও কি ডাকিতে হইবে?

মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমচন্দ্রের সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

তিনি রুদ্ধস্বরে কহিলেন "সুরবালা! দুর্ব্বলতাবশতঃ আমার কখন কখন এইরূপ হয়; এখনি সারিয়া যাইবে, তার জন্য ভাবিও না। কোন্ ব্যক্তি শত্রুতা করিয়া এ রকম পত্র লিখিয়াছে, আমি শীঘ্রই তাহার অনুসন্ধান করিতেছি। দেখিও সুরবালা! এ পত্রের কথা আর কাহারও নিকট কহিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে হেমচন্দ্রের মুখমণ্ডল পুনর্ব্বার

পাংশুবর্ণ হইল। তিনি অনেক কষ্টে আত্মসংযম করিয়া কহিলেন, "বামাঠাকুরুণ কি অন্যান্য কোন দাসীরা কেহই যেন এ বিষয় না জানে; কেন না, তাহা হইলে, ইহার অনুসন্ধান সম্বন্ধে বহু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। যা হ'ক, এক্ষণে আমি চলিলাম। কোন গোপনীয় কার্য্যের কারণ দুই দিন আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। খুব সাবধানে থাকিও।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হেমচন্দ্র দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে গেলেন।

যতক্ষণ হেমচন্দ্র নিকটে ছিলেন, ততক্ষণ আমার কোন ভাবনাই হয় নাই; কিন্তু চলিয়া যাওয়া মাত্র আমার মন সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। অশেষ প্রকার দুর্ভাবনার ছায়া আসিয়া আমার হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

সরলচিত্ত হেমচন্দ্রের কি তবে শত্রু আছে? আছে বৈ কি! পত্রই তো তার জাজ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত।

তার পর ভাবিলাম, পত্র পাঠ করিয়াই বা হেমচন্দ্র এতদূর অধীর হইলেন কেন? তাঁর বদন-প্রতিভাই বা বারবার মলিন হইল কেন? দাস দাসীগণের নিকটই বা পত্রের কথা গোপনে রাখিতে বারবার অনুরোধ কেন? ইহার মধ্যে কি কোন কারণ আছে না কি?

মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সহসা গাড়ীর চাকার শব্দ পাইলাম।

দ্রুতপদে উঠিয়াই খড়্খড়ের নিকট যাইলাম। দেখিলাম যে, একজন চাকর ও রাঁধুনী বামুণ সঙ্গে লইয়া হেমচন্দ্র গাড়ী করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

তীরবেগে চালক গাড়ী চালাইল।

হেমচন্দ্র মুখ বাহির করিয়া আমার গৃহের দিকে চাহিলেন ও হাত নাড়িয়া আমাকে শীঘ্র আসিবার ইঙ্গিত করিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী চোখের আড়াল হইয়া পড়িল।

হেমচন্দ্রের অদর্শনে আমি বড় নিরাশচিত্ত হইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলাম। হেমচন্দ্র যে কলিকাতা যাইবেন, তাহা পূর্ব্বে শুনি নাই।

পত্রপাঠ করিয়াই কি তাঁহার কলিকাতা যাইবার প্রয়োজন হইল? এমন কি, তাঁহার পান ভোজন পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। আবার উঠিলাম। ক্ষণকাল গৃহের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলাম।

যখন আর বেড়াইতে পারিলাম না। তখন শয্যার উপর গিয়া শুইলাম। ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময় বড় সুমিষ্ট গীতধ্বনি আমার কর্ণে আসিয়া লাগিল।

বোধ হইল, কে যেন বাগানে বসিয়া গান করিতেছে। গলাটী বড় মিষ্ট! যেন সুরে মাখান, তালে রং করা, মানে রসান করা, লয়ে গাঁথা!

আমি বালিস হইতে মাথা তুলিলাম।

গায়িকা গাইতে লাগিল;—

গীত।

মাঝমল্লার—একতালা।

সাধে কি আমি বিষাদিনী।
আমি কপালদোষে, পরবাসে,
হয়েছি কাঙ্গালিনী।

নির্দয় হইয়ে বিধি, হরিল হৃদয়-নিধি,
সে অবধি নিরবধি কাঁদি দিবা রজনী।
আপন বলিতে আমার, ত্রিভুবনে নাহি আর,
কি করিব কোথা যাব ভাবিয়া আকুল প্রাণী।

আর শয্যায় থাকিতে পারিলাম না। উঠিয়া ধীরে ধীরে বাতায়নের নিকট গেলাম। দেখিলাম, যে স্থানে হেমচন্দ্রকে প্রথমে বসিয়া সেতার বাজাইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম, গেরুয়া কাপড় পরা একটী সুন্দরী রমণী সেইখানে উপবিষ্ট আছে। এলোকেশগুলি ঠিক পিঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বামহাতে একগাছি রুলি, সীঁতের উপর সিন্দূর চিক্ চিক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

সম্মুখে একটী কমণ্ডলুর মত আংটা দেওয়া ঘটী। দক্ষিণ হস্তে একটী একতারা। কণ্ঠে একগাছি রুদ্রাক্ষমালা। সম্মুখে লোহার খাঁচায় একটী টীয়া পাখী। রমণীর বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর।

গায়িকার গীত সমাপ্ত হইল।

যে পরিচারিণীরা তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা বলিয়া উঠিল। "ভিখারিণী! আর একখানি গান গা! ভাল বক্‌সিস পাবি।"

ভিখারিণী ঘাড় নাড়িল।

কিন্তু একজন দাসী বলিল, "কর্ত্রী শুনিলেই তোর কপাল ফিরিবে।"

কিন্তু এবারে আর ভিখারিণী ঘাড় নাড়িল না। সে মুখ তুলিয়া বাতায়নের দিকে চাহিল।

[৫]

আমাকে দেখিবামাত্র যেন তার চক্ষু দুটী আরো ঔজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল। চক্ষেতে বিদ্যুদাগ্নির ভাব, কিন্তু আর কেহ দেখিতে পাইল না।

গায়িকা পূর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর স্বরে গান ধরিল ;—

রাগিণী সাহানা।—তাল কাশ্মীরি খেমটা।

নিদারুণ বিধি কি বাদ সাধিল।
অবলার মনে হৃদে শোকশেল হানিল।
না হতে প্রেমের অঙ্কুর,
কীটে হলো জর জর,
বাসনা শ্রমের ফল, তাহে নাহি ফলিল,
সোহাগের অনুরাগে বিষাদে বিনাশিল।
দুরাশা আশার মোহে,
কভু কি জীবন রহে,
কান্তের অনন্ত বিরহে দেহ মন দহিল,
অকালে যৌবনে শেষে যোগিনী সাজাইল॥

গান করিতে করিতে ভাবে যেন ভিখারিণীর দেহ দুলিতে লাগিল। ঘন ঘন হৃদয় উন্নত হইতে লাগিল।

গীতটী শেষ করিয়াই ভিখারিণী আবার উপরের দিকে দৃষ্টি করিল।

আমার মুখের প্রসন্নভাব দেখিয়া, ভিখারিণী একটু মধুর হাসি হাসিল।

গায়িকাকে যে কি পুরস্কার দেওয়া হইবে, এই অনুমতির কারণ পরিচারিকারা আমার দিকে বারম্বার চাহিতে লাগিল।

আমি ভিখারিণীকে উপরে আনিতে ইঙ্গিত করিলাম।

দাসীদের সহিত ভিখারিণী তার সর্ব্বস্ব লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

আমি বাতায়ন হইতে চলিয়া গেলাম। হেমচন্দ্রের ওরূপ ভাবে বাটী হইতে যাত্রা করার কারণ যে, আমার মন বিষণ্ণ হইয়াছিল, ভিখারিণীকে দেখিয়া ও তাহার সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া যেন মনের বিষণ্ণতা কতক পরিমাণে বিলুপ্ত হইল।

ভিখারিণীর আত্মবৃত্তান্ত—স্বপ্ন।

পরিচারিণীগণ সহ ভিখারিণী উপরে আসিল। একখানি বাঘের ছাল বিছাইয়া ভিখারিণী মেজের উপর বসিল।

আমার ইঙ্গিতানুযায়ী পরিচারিণীরা কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য আনিবার কারণ সকলে চলিয়া গেল।

আমি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁগা বাছা! তুমি এমন সুন্দরী, এয়োস্ত্রীর চিহ্ন তোমাতে সকলই আছে, তবে তুমি এ বয়সে এরূপ ভাবে বেড়াইতেছ কেন? তোমার কি ভরণ পোষণ করিবার আর কেহ নাই? আসিয়া অবধি ভিখারিণী আমার মুখের পানে এক মুহূর্ত্তের কারণও দৃষ্টি করে নাই; কিন্তু আমি কথা কহিবামাত্র সে যেন চমকাইয়া উঠিল। বিদ্যুতের ন্যায় তার চক্ষে সেই জ্যোতি একবারমাত্র ক্রীড়া করিয়া উঠিল।

ভিখারিণী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, আর কেহ নিকটে নাই। তখন স্থির মধুর গম্ভীর স্বরে কহিল, "মাগো! তোর

স্নেহের কথা শুনে আমার জলন্ত অঙ্গ শীতল হইল। এমন কথা ভিখারিণীকে আজ পর্য্যন্ত কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। তুই মা! আমায় তোর কাছে রাখ্‌বি ? আমি তোর কাছে থাকিলে বেশ থাকিব মা! মা! বল্ না, তোর দুঃখিনী মেয়েকে স্থান দিবি? আমি তোকে কত গান শোনাব; কত ঠাকুর, কত তীর্থের কথা শোনাব। তোর কাছে মরিলেও আমি ভাল থাকিব। মা! মা! বল্ না মা?"

ভিখারিণীর কথা গুলি আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিল। এ রকম মিষ্টস্বরে আমায় কেহ আর কখন মা বলিয়া ডাকে নাই। ছেলে বেলায় আমার রাঙ্গা মা কখন কখন এই রকম করিয়া ডাকিতেন। ভিখারিণীর কণ্ঠস্বরটীও যেমন আমার মায়ের কণ্ঠস্বরের মত বোধ হইতে লাগিল।

আমি কহিলাম, দেখ বাছা! তুমি আমার নিকট থাকিলেই যদি একান্ত ভাল থাক, তাহা হইলে, তোমাকে রাখিবার কারণ চেষ্টা করিয়া দেখিব। বাটীর কর্ত্তা আগে বাটীতে আসুন। ভিখারিণী আদরের সহিত কহিল, "কেন মা! কর্ত্তা কি তোর অবাধ্য?"

আমি লজ্জায় নতমুখী হইলাম।

ভিখারিণী আবার কহিল, "মা! তুই আমার মা, আমি তোর মেয়ে। মায়ের কাছে মেয়ে থাকিবে, তাতে বাপের আপত্তি কি?"

আমি আরো লজ্জায় জড়ীভূত হইলাম।

কোন্ মুখে ভিখারিণীর কাছে বলিব যে, বাটীর কর্ত্তা হেমচন্দ্রের সহ আমার বিবাহ হয় নাই, আমি তাঁহার পত্নী নহি; আমি তাঁর সাগর সিঞ্চিত মানস পত্নী।

আমি ভিখারিণীকে আশ্রয়ের আশ্বাস দিয়া কহিলাম, কর্ত্তা আসিলেই তোমার থাকিবার সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ভিখারিণী আনন্দে গদ গদ হইয়া কহিল, "মা! মা! আমাকে রাখ্‌বি? আমার স্বামীকেও রাখ্‌বি তো?"

আমি কহিলাম, তোমার স্বামী কোথায় মা?

ভিখারিণী কহিল, "এই যে মা আমার স্বামী!" এই বলিয়া সেই টিয়া পাখীর গায়ে হস্ত বুলাইতে লাগিল।

আমি সচকিতে ভিখারিণীর মুখের পানে চাহিলাম।

ভিখারিণী একমনে পাখীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

আমি ক্ষণকাল নিঃশব্দে ভিখারিণীর কার্য্য দেখিতে লাগিলাম।

ভিখারিণী যেন যথার্থই পতিসেবা করিতে লাগিল।

আমি অনেকক্ষণ বিলম্বে কহিলাম, মা! মা! তোর স্বামী এ রূপ রূপ ধারণ করিল কেন?

ভিখারিণী কাতর স্বরে কহিল, "শুন্‌বি মা! তোর মেয়ের কথা শুন্‌বি? অভাগিনীর দুঃখের বৃত্তান্ত শুন্‌বি? তবে বোস্, মেয়ের কাছে বোস্। কাঙ্গালিনী মেয়ের দুঃখের কাহিনী স্থির হ'য়ে শোন্।"

এই বলিয়া ভিখরিণী আমার আরো নিকটে সরিয়া আসিল।

ভিখারিণী যখন পাখীকে স্বামী বলিয়া উল্লেখ করিল, তখন হতেই আমার বোধ হইল যে, ভিখারিণী উন্মাদিনী।

তাহার রহস্যপূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল।

আমি ঔৎসুক্য চিত্তে কহিলাম, ভাল বাছা! তোমাকে দেখিলে যেন সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু তুমি যে পথের ভিখা-

রিণী হইয়াছে কেন, তাহা শুনিবার জন্ম বড় ইচ্ছা হইয়াছে। যদি তার কোন প্রতিকার করিতে আমার সাধ্য থাকে, অবশ্য করিব।

ভিখারিণী কহিল, "আছে মা আছে।"

আমি বলিলাম, সে কি মা?

অতি কষ্টের সহিত ভিখারিণী কহিল, "মিষ্ট কথা, মিষ্ট কথা মা! যত্ন যত্ন!"

আমি সস্নেহে কহিলাম, মা! আমি কখনও কটু কথা জানি না। আমার নিকট মিষ্ট কথার অভাব নাই। আর যত্ন, তা আমি অতি নিকৃষ্ট প্রাণীকেও কখন অযত্ন করি না।

ভিখারিণীর চক্ষুর্জ্যোতি পুনশ্চ মুহূর্ত্তের কারণ উজ্জল হইয়া উঠিল; কিন্তু নিমিষ মধ্যে আবার সেই ধীর প্রশান্ত ভাব।

ভিখারিণী মুগ্ধচিত্তে কহিল, "মা! তবে তোকেই আমার সকল কথা বলিব। তুই মা মন দিয়ে শুনিস্ মা! মেয়ে তোর অনেক উপকারে আস্‌বে মা! কারও কথায় আপনার মেয়েকে জামাইকে তাড়াস্‌নে মা! আমি তোর পেটের মেয়ে, আর এই তোর জামাই মা! শোন্ তবে;—

"মা! কাল্‌না প্রদেশে আমার পিতা একজন বড় জমিদার ছিলেন। আমি বাপের এক মেয়ে, ছেলেবেলায় মা মরেন, কাজেই, আমি বাপের বড় আদরের ছিলাম। এগার বছর বয়সে আমার এক বঙ্গদেশীয় কুলীনের সঙ্গে বিবাহ হয়। আমায় ছাড়িয়া বাবা একা থাকিতে পারিবেন না বলিয়া, তিনি অনেক খুঁজিয়া অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, সৎকুলীন সর্ব্বরূপ গুণযুত যুবা আনিয়া আমার বিবাহ দিলেন।

"আমার স্বামীও ভবিষ্যতে অতুল ধনের অধিকারী হইবেন

বলিয়া যথেষ্ট পুলকিত ভাবে শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিলেন।

"অল্পকালের মধ্যেই নিকটস্থ পল্লীর অনেক বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গে আমার স্বামীর আলাপ পরিচয় হইল।

"বন্য জন্তু শিকারে তাঁর বড় আস্থা ছিল। তিনি প্রতি সপ্তাহে ঘোড়ায় চড়িয়া অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া প্রায় বনবিহারেই যাইতেন।

"তাঁর এরূপ প্রবৃত্তি দেখিয়া পিতা কিছু ক্ষুণ্ণ মন হইতে লাগিলেন। তাঁর ইচ্ছা যে, তাঁর সংসারের সর্ব্বস্বধন এক মাত্র কন্যার স্বামীই যখন তাঁর অতুল ধনের ভবিষ্যৎ অধিকারিণী, তখন সেই জামাতা যাতে জমিদারী কার্য্য বুঝিয়া, ভবিষ্যতে বিষয় রক্ষা করিতে পারেন, ইহাই তাঁর মনোগত ভাব; আরো শিকার প্রভৃতি পাশব বৃত্তির উপর বাবার বিশেষ বিদ্বেষ ভাব ছিল।

"যদিও বাবা জামাতাকে তাঁর চরিত্র ও প্রবৃত্তির সংশোধন সম্বন্ধে বার বার অনুরোধ করিলেন, তত্রাচ তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। এই রকমে পাঁচ বৎসর কাল কাটিল। ক্রমে আমার যৌবন-পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া আসিল। পিতা আমার অলৌকিক রূপ লাবণ্য দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন যে, 'এইবার হয় তো জামাতার স্বভাব সংশোধিত হইবে, তিনি বনবিহার কার্য্য ছাড়িয়া গৃহবাসী হইবেন; কিন্তু সে আশাতেও তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেন।

"আমি যখন বালিকা ছিলাম, তখন বরঞ্চ আমার স্বামী দুই তিন দিন অন্তর বাটীতে আসিতেন; কিন্তু আমি যুবতী হওয়া পর্য্যন্ত, তাঁর গৃহে আসা আরো বিরল হইয়া পড়িল। তিনি শিকারে যাওয়ার ছলে কখনও কখনও এক এক মাস অনুপস্থিত থাকিতে

লাগিলেন। এইরূপ দেখিয়া বাটীর সকলেই চিন্তাকুল হইতে লাগিল।

"আমার বাপের পুরাতন আমলারা কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, 'শিকারে যাইয়া আবার কে কোথায় দশ পনের দিন করিয়া থাকে এবং সেখানেই বা বাস করিবার কারণ কি? গৃহে শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এরূপ প্রবাসে যাওয়া সম্বন্ধে অন্য কোনও বিশেষ গূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহা জানা আবশ্যক; নতুবা, রূপবতী যুবতী বনিতা পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত বনে বনে বেড়ানো, কি একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্ব লওয়া আবশ্যক।'

"আমলাবর্গের মুখে এই কথা শুনিয়া বাবা আমাকেও সব বলিলেন। আমার সহিত স্বামী যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধেও পিতাকে যতদূর পারিলাম বলিলাম।"

ভিখারিণীর এই কথা শুনিয়া আমিও প্রশ্ন করিলাম যে, মা! তোর স্বামী তোর সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিত মা? তোকে কি জামাই ভাল বাসিত না? এমন ভগবতীর ন্যায় সুন্দরী ভার্য্যাকে সে কি অযত্ন করিত?

আমার কথা শুনিবামাত্র ভিখারিণীর চোখে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল আসিল।

অনেক কষ্টে আঁচলে চক্ষু মুছাইয়া আমি ভিখারিণীকে সুস্থ করিলাম।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া ভিখারিণী মুখ তুলিল। আমি সস্নেহে বলিলাম, তার পর মা! তার পর কি হইল?

ভিখারিণী কহিল, "আমার স্বামী গৃহে আসিলেই ভোজন

করিয়া শয়ন করিতেন, আমি পদসেবা করিতে নিকটে আসি-লেই ত্রস্ত ভাবে তিনি উঠিয়া বসিতেন ও কহিতেন, 'প্রিয়ে! সুন্দরী! তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর। আমি একটা ব্রত লইয়াছি, তাহাতে স্ত্রী স্পর্শ করা নিষেধ; সেই জন্য, আমি তোমাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করি তার, জন্য তুমি কিছু মনে করিও না।'

"আমি বিষণ্ণ বদনে স্বতন্ত্র শয্যায় গিয়া শয়ন করিতাম। সমস্ত রাত্রি কাঁদিতাম, চোখের জলে বালিস ভিজিয়া যাইত; কিন্তু স্বামী আমার কোন সংবাদ লইতেন না।

"যদি আমার মা থাকিত, তাহা হইলে, আমার এতদূর দুর্গতি হইত না। আমি বাবাকে লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিতাম না। তবে তিনি জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম।

"শুনিবামাত্র বাবা ক্রোধে অধীর হইলেন। আমাকে কহি-লেন, মাগো! তোর কথা শুনিয়া আমার বুকে বড় শেল বাজিল। তুই এই চার বৎসরের মধ্যে আমাকে এক দিনও এ কথা বলিস্ নাই কেন? জামাতার রহস্যময় কার্য্যের তত্ত্ব জানিয়া তবে আমি নিরস্ত হইব।"

"তার পর, বাবা বাহিরে গেলেন।"

ভিখারিণী অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সেই শুক পক্ষীর প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "নাথ! দাসীর সহিত আজও কথা কহিবে না কি?"

আমি বহুক্ষণ নীরবে তাহার কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। পরিশেষে কহিলাম, মা! আর বলা হবে না কি? ভিখারিণীর

মোহ ভাঙ্গিল। সে চকিতভাবে কহিল, "মা! মা! তোকে বলিব না তো কাকে বলিব? মা! তুই যদি তখন আমার কাছে থাক্‌তিস্‌, তা হ'লে আমার এ দুর্গতি হতো না মা! কতদূর বলিতে ছিলাম মা? হাঁ হাঁ, মনে পড়িয়াছে। সেই দিন রাত্রে আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন। ভোজনান্তে তিনি শয়ন করিলেন, আমি গৃহ মধ্যে যাইলাম। আমাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই তিনি কহিলেন, 'দেখ সরলে! তুমি আজ অন্য গৃহে গিয়া শয়ন কর। আমি কাল এক মাসের কারণ অন্যত্র যাব, যাবার সময় তুমি যেন আমার সম্মুখে আসিও না, তাহা হইলে, আমার সকল কার্য্য বিফল হইবে। আমার স্বামীর মুখে এইরূপ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহিরে গেলাম।

"বাহিরে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁচল বিছাইয়া শয়ন করিলাম। সবে মাত্র একটু তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময় কে যেন আসিয়া আমার গায়ে হাত দিয়া জাগাইল। আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম যে, বাবা আমার সামনে দাঁড়াইয়া আছেন। মিট্‌মিটে চাঁদের আলো তাঁর মুখে পড়িয়াছে। সেই আলোকে দেখিলাম যে, তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে।

"আমি উঠিয়া বাবার গলা জড়াইয়া ধরিলাম। বাবা ভাঙ্গা-স্বরে কহিলেন, 'অভাগিনি! তোর যে এমন পোড়া কপাল, তা জানিতাম না। আমার কন্যা হয়ে মাটীতে পড়িয়া কাঁদিস্, আর ঐ নৃশংস পাজী বেটা স্বচ্ছন্দ মনে নিদ্রা যায়!'

"এই বলিয়া বাবা আমাকে আপনার শয়ন গৃহে লইয়া গেলেন এবং রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। আমার কথা

শেষ হইলে পর বলিলেন, 'দেখ মা! এর ভিতরে যে কি কাণ্ড, তা আমি দুই দিনেই বাহির করিব। তুমি আজ আমার শয্যায় শয়ন কর। রাত্রি আর অধিক নাই। আমি সনাতনকে উঠাইতে চলিলাম।' এই বলিয়া বাবা বাহিরে গেলেন। আমিও দুর্গা অসুর গণেশ ভূত প্রেতিনী শঙ্খচূর্ণী রাক্ষসী ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

"শয্যা হইতে উঠিয়া নিজ গৃহে আসিয়া দেখিলাম যে, স্বামী চলিয়া গিয়াছেন। আহারের সময় বাবার মুখে শুনিলাম যে, সনাতন ছদ্মবেশ ধরিয়া ভিক্ষুকের বেশে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছে।

* * * * *

"আমাদের সনাতন অনেক দিনের পুরাতন চাকর। বাবার বড় বিশ্বাসী। সনাতন দেখিতে শুনিতে চাকরের মত নহে। সনাতন বড় চতুর, সাহসী, বুদ্ধিমান্। সনাতনকে পাঠাইয়া পিতা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছিলেন। সনাতন যে তাঁহার কার্য্য সফল করিয়া আসিবে, এ বিষয়ে পিতার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। দ্বিতীয় দিনের বেলা অবসান হইল, কিন্তু সনাতন ফিরিল না। তৃতীয় দিনে সনাতনের অপেক্ষায় সকলে বসিয়া বসিয়া স্নানাহার করিল। রাত্রি হইল, তত্রাচ সনাতনের দেখা নাই।

"চতুর্থ দিনের প্রাতে বাবার কাছারী বাড়ীতে আমলাগণ অন্যান্য কাজ ছাড়িয়া, সনাতনের কথাই আন্দোলন করিতে লাগিল।"

"কেহ কেহ বলিল যে, 'সনাতন হয় তো পথ হারাইয়া অন্য কোন দূর স্থানে গিয়া পড়িয়াছে।' কেহ বলিল, 'সনাতন পথ

হারাইবার লোক নয়। বোধ হয়, তাকে কেউ মারিয়া ফেলিয়াছে কেহ বলিল, না তা নয়, 'বাঘে ধরাই সম্ভব।'

"এই রূপে সকলেই সনাতনকে যমের বাড়ী দিতেছে। বাবাও হেঁট মুণ্ডে বসিয়া আছেন, এমন সময় দাওয়ানজী বলিলেন, 'আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, সনাতনের কোন বিপদ্ ঘটে নাই, সে নিশ্চয় কার্য্যোদ্ধারের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে, যদ্যপি অদ্য রাত্রে না আসিয়া পৌছায়, তাহা হইলে, কাল প্রাতে চারি জন পাইক তার অনুসন্ধানে পাঠান হউক।'

"এই রূপ পরামর্শ স্থির হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

সনাতন সংবাদ।

"সেই দিন রাত্রে আমার আর কিছুতেই নিদ্রা আসিল না। শয়ন করিয়া থাকা নিতান্ত কষ্টকর হওয়ায়, শয্যা হইতে উঠিয়া জানালার নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম।"

"পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক হাসিতেছে।

"ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গাছের ডালগুলি বায়ুভরে দুলিতেছে। উদ্যানে ফুলগুলি ফুটিয়া যেন চাঁদের সহিতে ফুট্ ফুট্ করিয়া হাসিতেছে। মৃদু মন্দ পবন, যেন কি অন্বেষণ করিবার আশায় চারিদিকে বেড়াইতেছে। গাছের পাতাগুলি তার গায়ে লাগিয়া ঝুর্ ঝুর্ শব্দ করিতেছে।

"আমি চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কথা কহিলাম। ছোট ছোট তারাগুলি চোখ মট্‌কাইয়া বলিল যে, 'আমারও সব বুঝিয়াছি।'

"সহসা বৃক্ষতলার শুক্‌না পাতার মর্ম্মর শব্দ শুনিতে পাইলাম।

"পরক্ষণে দেখিলাম যে, দুইটী মনুষ্যমূর্ত্তি বড় আমগাছের নিম্ন দেশ হইতে বাহির হইয়া আস্তে আস্তে ঐ জানালার দিকে আসিতে লাগিল।

"প্রথমেই উহারা চোর ডাকাইত হইবে, এই জ্ঞানে চীৎকার করিব মনে করিলাম; কিন্তু পরক্ষণে এক ব্যক্তি মুখ তুলিয়া চাওয়াতে, বাবার মত দেখিলাম। মনে ভাবিলাম যে, বাবা এত রাত্রে কার সঙ্গে বাগানে বেড়াইতেছেন? ক্রমে তারা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে দেখিলাম যে, আমাদের বাটীর পুরাতন ভৃত্য সনাতন। সনাতনকে দেখিয়াই বড় আনন্দ হইল। ইচ্ছা হইল, সনাতন দাদাকে জিজ্ঞাসা করি, কখন আসিলে? কিন্তু মনে করিলাম, যখন বাবা তার সঙ্গে কথা কহিবার কারণ নির্জ্জন বাগানে গিয়াছেন, তখন আমার সাড়া দেওয়া ভাল হয় না; এই ভাবিয়া নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁরা যে এতক্ষণ কি কথা কহিতেছিলেন, তা আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই; কিন্তু যখন উহাঁরা জানালার নীচে আসিলেন, তখন বাবা বলিলেন, 'সনাতন বেড়াইয়া কথা হয় না; এস, এইখানে দুজনে বসি, আর রাত্রি অনেক হইয়াছে, বাটীর কেহই বোধ হয় জাগিয়া নাই।'

"সনাতন বলিল, 'তবে আসুন, এই চাতালে উপর বসি।'

"এই বলিয়া উভয়ে ফুলের কেয়ারির মধ্যে শাণের উপর বসিলেন।

"একবার মনে হইল, আমি ভিতরে চলিয়া যাই, তাঁদের গোপনীয় কথা শুনা আমার উচিত নয়। কিন্তু স্ত্রী জাতির

স্বভাব এই, গোপনীয় কথা শুনিতে পাইলে আর কিছুই চায় না। সে লোভ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, গোপনীয় কথা শুনিবার কারণ আমি অন্তরালে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

"বাবা বলিলেন, 'সনাতন! তুমি যগুপি আজ রাত্রে না আসিতে, তাহা হইলে, কাল প্রাতে তোমার অনুসন্ধানে আমি চারিজন পাইক পাঠাইতাম। তোমাকে দেখিয়া আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। এক্ষণে যে কার্য্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কি করিয়া আসিলে বল? ভাবনায় আমি আজ চারদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি।'

"সনাতন ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, 'বাবু! যখন আমি জামাই বাবুর পশ্চাতে যাত্রা করি, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম যে, দুই দিনেই ফিরিয়া আসিতে পারিব।'

"বাবা কহিলেন, 'তবে তোমার চারিদিন বিলম্বের কারণ কি?'

"সনাতন কহিল, 'কেন যে এত বিলম্ব হইল, তা শুনিলে আপনি জ্ঞানহারা হইবেন। আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, আপনি তাহা দেখিলে বোধ হয়, আর ভয়ে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না এবং এই রাত্রে বাটীর বাহির হইতেও আপনার সাহস হইত না।'

"বাবা সনাতনকে কহিলেন, 'সে কি সনাতন! তোমার কথা শুনিয়াই যে আমি ভয়ে অভিভূত হইলাম। ব্যাপার খানা কি? সামান্য কারণে তো তুমি ভয় পাইবার লোক নও!'

"সনাতন কহিল, 'তবে আমি গোড়া থেকে বলি শুনুন;— জামাই বাবু এখান হইতে বাহির হইয়া পাঁচ ক্রোশ পথ

ঘোড়ার উপরেই চলিলেন। আমি অতি কষ্টে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। পাঁচক্রোশ পথ যাইয়া সম্মুখে এক নদী পাইলাম। নদীর উপরই একখানি মেটে ঘর। জামাই বাবু সেইখানে ঘোড়া হইতে নামিয়া নিজ হস্তে কতকগুলি তৃণ কাটিলেন ও সেই গৃহ হইতে কতকগুলি ছোলা বাহির করিয়া জলে ধুইয়া ঘরের এক কোণে একটা কাষ্ঠপাত্রে রাখিলেন। তার পর তিনি ঘোড়ার মুখের কড়া লাগাম প্রভৃতি সমস্ত খুলিয়া ঘোড়াকে ঘরের ভিতর রাখিয়া চাবি দিলেন। তার পর তিনি গায়ের জামা জোড়া খুলিয়া নদীর দিকে চলিলেন।

"আমি বুঝিলাম যে, তিনি সাঁতার দিয়া নদীপার হইবেন।

"আমিও আর একধার দিয়া নদীপার হইলাম। বেলা দুই প্রহর অতীত হইলে, বনের মধ্যে তিনি একটা গাছ তলায় বসিলেন এবং বস্ত্রের মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য লইয়া জলযোগ করিলেন। আমিও নিতান্ত বনফলের ভরসায় যাই নাই। দূরে বসিয়া আমিও নিজকার্য্য সারিলাম।

"সূর্য্যের তেজ কিছু হ্রাস পাইলে, জামাই বাবু উঠিলেন। ছায়ার ন্যায় আমিও তাঁর পাছে পাছে চলিতে লাগিলাম।

"সূর্য্য অস্ত যায় যায়, এমন সময়ে আধ ক্রোশ দূরে নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া একটী খুব উচ্চ দেবমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইলাম।

"আর চতুর্দ্দিকেই বন।

সন্ধ্যা সমাগম দেখিয়া, জামাই বাবু কিছু দ্রুতপদে চলিলেন। আমাকেও অগত্যা তদ্রূপ করিতে হইল।

"ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা সেই মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলাম।

"দূর হইতে দেখিলাম যে, একজন দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ লম্বিত জটাজূট শ্মশ্রুবিশিষ্ট পুরুষ মন্দিরের প্রশস্ত শান নির্ম্মিত দাওয়ার উপর চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন। সম্মুখে চারিটা রূপার সামাদানে আলোক জ্বলিতেছে। আমি নিকটস্থ একটী অতি পুরাতন বটগাছের উপর উঠিলাম। সে স্থান হইতে মন্দিরের ভিতর পর্য্যন্ত উত্তমরূপ দেখা যায়।

"মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড উঠান। তার দুইধারে দুখানি প্রশস্ত চালা। বোধ হয়, তাহার ভিতর পঁচিশ ত্রিশটী ঘর আছে। নিবিড় বনের মধ্যে এই সমস্ত দেখিয়া আমি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

"সন্ধ্যার অন্ধকারের সময়ে আমি এমন একটী নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে উঠিয়াছিলাম যে, সেখান হইতে সমস্ত মন্দিরের ভিতরটা দেখিতে পাওয়া যায় ও একটী কথা কহিলে শুনিতে পাওয়া যায়। জামাই বাবু নিকটস্থ একটী সরোবর হইতে মুখ হাত ধৌত করিয়া, সেই দেবী চণ্ডীর মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই ধ্যানস্থ মহাপুরুষের নিকট যাইয়া, প্রণত হইলেন ও যোড় হস্তে তাঁহার সমক্ষে বসিলেন।

"কিয়ৎকাল পরেই সেই মহাপুরুষ চক্ষু খুলিয়া আনন্দিত হইয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, 'বৎস! আসিয়াছ, তোমার কারণ আমি বড় চিন্তাযুক্ত ছিলাম। যদ্যপি আমি ভালই জানি যে, দেবী নিজ কার্য্য নিজে উদ্ধার করিবেন, তত্রাচ, তোমার বিলম্ব দর্শনে আমি মহা ভাবনায় পড়িয়াছিলাম।

"আজ আমাদের কি আনন্দের রজনী, তা কি তোমার স্মরণ আছে?' মহাপুরুষের বাক্য শেষ হইল, জামাইবাবু কহিলেন,

'আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ও আপনার শ্রীচরণ দর্শন এই মাত্র আমার মনে আছে, আর আমার কিছুই মনে নাই।' মহাপুরুষ পুনশ্চ কহিলেন, 'বৎস! শুধু আমাকে সে কথা বলিলে, দেবীর প্রতি অবমাননা করা হয় আমি চণ্ডিকার দাস মাত্র, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাই আমার কার্য্য। বৎস! যদ্যপি তোমার স্মরণ না থাকে, তো দেবীর সজ্জা দেখিয়া মনে করিয়া দেখ, যে চার বৎসর কাল তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ, তাহার মধ্যে চণ্ডিকা মাতার এ বেশ আর কখন ও দেখিয়াছ কি না?' এইমাত্র কহিয়া মহাপুরুষ সেই মন্দির মধ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। জামাইবাবু মুহূর্ত্তের কারণ দৃষ্টি করিয়াই 'উঃ! কি ভয়ঙ্করা! কি ভীষণা!' এই মাত্র বলিয়াই মূর্চ্ছা গেলেন।

"মহাপুরুষ কিঞ্চিন্মাত্র বিস্মিত না হইয়া সম্মুখস্থিত কোশার জল লইয়া কুম্ভগ্রে করিয়া কি মন্ত্র বলিতে বলিতে তাঁহার মুখে বারম্বার দিতে লাগিলেন।

"আমি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। চণ্ডিকার দিকে চাহিয়াই যে জামাইবাবু কেন মূর্চ্ছা গেলেন, তাহা দেখিবার কারণ আমার ইচ্ছা হইল। আমি সেই বৃক্ষ শাখা হইতে শরীর ঝুলাইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে দৃষ্টি করিলাম। একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম বটে, কিন্তু ভয়ানক কিছুই দেখিলাম না।' সনাতন এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিল। বাবা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখিলে সনাতন? বল বল, জামাইবাবু মূর্চ্ছা গেলেন কেন?"

সনাতন বলিল, "জামাইবাবু মূর্চ্ছা গেলেন কেন, তাহা আমি তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। চণ্ডিকার বেশ বা

মূর্ত্তিতে কিছুই ভয়াবহ ছিল না, বরঞ্চ দেবীর একটী অপূর্ব্ব বেশ দেখিলাম।’

“বাবা অধীর হইয়া কহিলেন, ‘সনাতন! কি দেখিলে, শীঘ্র বল, তুমি মাঝে মাঝে চুপ কর কেন?’

“সনাতন পুনশ্চ কহিল, ‘আমরা সচরাচর চণ্ডীমূর্ত্তির যেরূপ বেশভূষা ও বর্ণ দেখিয়া থাকি, তাহার কিছুই দেখিলাম না। শুভ্রকান্তিবিশিষ্টা বীণাপাণির ন্যায়, মন্দিরস্থিতা দেবীর নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ। কর্ণযুগলে শ্বেত জবা, পরণে শুক্ল বাস। চতুর্ভুজার সমস্ত শ্বেতবর্ণ। দীপের আলোকে তাঁর অঙ্গের শ্বেত আভা যেন আরো সমুজ্জ্বলিত হইয়া শরতের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় দেখা যাচ্ছিল।

“এ সুনির্ম্মল মুখকান্তি এত শুভ্র বেশ দেখিয়া যে, জামাইবাবু কেন মূর্চ্ছা গেলেন, তাহা জানিবার কারণ আমি কাণ খাড়া করিয়া রহিলাম।

“সামান্য কালের মধ্যেই তাঁর চৈতন্য হইল।

“চৈতন্য লাভ করিয়াই তিনি ভয়বিহ্বল নেত্রে আর একবার মন্দিরের দিকে চাহিলেন এবং পরক্ষণেই সেই মহাপুরুষের পদ ধারণ করিয়া ‘গুরো! রক্ষা করুন! গুরো! ক্ষমা করুন! অধমকে মুক্তি দেন।’ ইত্যাদি কাতরোক্তি করিয়া তাঁর পদে লুটাইয়া পড়িলেন।

“সহসা ব্রহ্মচারীর সমস্ত প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল। দীপালোকে প্রথমে যে প্রশান্ত গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া তাঁহাকে সাতিশয় দয়ালু ও সংযমী বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁর ভয়াবহ পরিবর্ত্তন দেখিয়া, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

“জামাই বাবুকে পদতলে লুণ্ঠিত দেখিয়া, ব্রহ্মচারীর নয়ন-

যুগল ক্রোধে রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মস্তকের জটাজূট শিহরিত হইল ও সমস্ত অঙ্গ বৃহদায়তন হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। আর তাঁর ওষ্ঠাধর যেন কোন ঘৃণা ও অন্য ভাবে কুঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। 'হাঁ রে ভীরু! তুই তবে বুঝি রূপ-লাবণ্যবতী বনিতার রূপে মুগ্ধ হইয়া ব্রত ভঙ্গ করিয়া কলুষিত হইয়াছিস্, তাই দেবীর শুভ্রবেশ নিরীক্ষণ করিয়াই তোর মনে মহাভয়ের সঞ্চার হইল? শোন্ পাপাচারি! ব্রতপূর্ণ না করিয়া যদ্যপি কামের পথে পদার্পণ করিয়া দেহ মন কলুষিত করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে, তার পরিণাম ফল কি জানিস্?'

ব্রহ্মচারীর তীব্রস্বর পাতায় পাতায় প্রত্যেক গুহায় গুহায় ও মন্দিরের চতুর্দ্দিকে "জানিস্! জানিস্!" শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"জামাইবাবু কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'গুরো! ক্ষমা করুন, আমি আপনার শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, আমি ব্রতের কোন নিয়মই ভঙ্গ করিব না ও করি নাই। কিন্তু আমি, আর চক্ষে সে ভয়াবহ ব্যাপার দেখিতে পারিব না। যে ব্যাপার একবার দেখিয়াছি, তাহা এখনও আমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে। গুরুদেব! আমাকে ক্ষমা করুন।' ব্রহ্মচারীর পুনশ্চ যেন দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি শান্তভাবে বলিলেন, 'দেখ বৎস! তোমার চির কাপুরুষত্ব ভীরুভাবের কি কখন ও অপসারণ হইবে না? দেবী ক্ষুধিতা, সেই জন্য, তিনি শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছেন। তোমরা তাঁর সন্তান, মাতাকে কি আহার দিবে না? তোমার গর্ভধারিণী যদ্যপি ক্ষুধায় কাতর হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হন, তাহা হইলে, তুমি কি তাহাকে খাইতে না দিয়া তাড়াইয়া

দিবে? আমরা চণ্ডিকা দেবীর সন্তান, তিনি আমাদের নিকট খাইতে চাহিলে, অবশ্যই তাঁহার আমরা তৃপ্তিসাধন করিব।'

"জামাই বাবু কাতর স্বরে কহিলেন, 'জগতে যাহা কিছু উপাদেয় আছে, তাহা দিয়া আমি দেবীর তুষ্টিসাধন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু গুরো! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন!'

"ব্রহ্মচারী কহিলেন, "অরে মূর্খ! যাঁর ইচ্ছায় পলক কালের মধ্যে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত হইয়াছে, সেই ইচ্ছাময়ীকে কোন্ উপাদেয় দ্রব্য দিয়া তৃপ্ত করিবি? তিনি শোণিত-বিলাসিনী, শোণিত-রঙ্গিণী, শোণিত ব্যতীত আর তাঁর তৃপ্তি সাধনের উপায় কি? দেখ দেখি, জগন্মাতার কি ঐ রূপ ঐ বেশ, না জননী শোণিত পার্ব্বণের কারণ সমস্ত শুভ্রবেশ পরিয়া বসিয়া আছেন?' মায়ের ঐ শুভ্র অঙ্গ শুভ্রবেশ সমস্ত, নরশোণিতে প্লাবিত করিতে হইবে, যদ্যপি অনিচ্ছুক বা অপারক হস্, তাহা হইলে, দেবীর কোপে পড়িয়া এককালে সর্ব্বস্বান্ত হইবি। আর তোকে যখন আমি শিষ্যত্বপদে অধিরূঢ় করি, তখন তুই আমার নিকট কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিস্, তা তোর বিশেষ স্মরণ আছে তো?'

"এই পর্য্যন্ত বলিয়া ব্রহ্মচারী রোষকষায়িতলোচনে জামাই বাবুর দিকে স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তিনি সভয়ে ব্রহ্মচারীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'গুরো! যখন আমি আপনার শিষ্য হইয়াছি, তখন আমি সমস্ত বিষয়ই বিবেচনা করিয়াছি; কিন্তু নরশোণিত ব্যতীত যে দেবীর তুষ্টি সাধিত হয় না, এটী আমার জ্ঞান ছিল না। গুরো! কিরূপে আজ চণ্ডিকা মাতার তৃপ্তি সাধিত হইবে বলুন, আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।'

"ব্রহ্মচারীর নয়নের উজ্জ্বল ভাবের হ্রাস হইল। তাঁর শিহরিত

জটাজূট পুনশ্চ কোমল হইল, তাঁর ওষ্ঠাধরের কুঞ্চিত ভাব মিলিত হইল, তাঁর ক্রোধোন্নত দেহ স্বভাব ধারণ করিল। তাঁর স্বরের বিকৃত ভাবের লোপ হইল। তিনি স্থির গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, 'বৎস! বহুমূল্যবান্ রত্ন নিধি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা কূপে থাকে না, যার সেই সকল রত্নলাভের বাঞ্ছা থাকে, সে বারিধির সুগভীর নীরমধ্যে নিমগ্ন হয়। সাগর গর্ভস্থিত হিংস্রক জন্তুদিগের ভয়ে অভিভূত হইলে, আর তাহার রত্ন অন্বেষণ হয় না। গোলাব পুষ্পে যার অনুরাগ থাকে, তাকে অবশ্যই কণ্টকের আঘাত সহ্য কর্ত্তে হয়।'

"যাঁর চরণ দর্শন-লালসায় সমস্ত জগদ্বাসী মুনি ঋষি অগণ্য বৎসর অনশনে অনিদ্রায় তপে রত থেকেও সিদ্ধিকাম হন না, সেই জগন্মাতার আমরা প্রিয় সন্তান, আমাদের অপেক্ষা সৌভাগ্য কার? হাঁরে অবোধ! চারি বৎসরের মধ্যে কি তোর এ সামান্য জ্ঞানও হয় নাই?"

"জামাইবাবু কহিলেন, 'গুরো। আমি নিতান্ত মূঢ় ও ভ্রান্ত। জ্ঞানের আলোক দানে আমার মনের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুন। গুরো! দাসের প্রতি রোষান্বিত না হইয়া বরঞ্চ কৃপাবান্ হউন। কিন্তু দেব! মাতার যদ্যপি নরশোণিত-পিপাসা হইয়া থাকে, তো কি উপায়ে সে তৃষ্ণার শান্তি করিবার উদ্যোগ করিতেছেন?"

"ব্রহ্মচারী কহিলেন, 'হাঁরে মূঢ়! আমরা সুধু তাঁর দাসানুদাস মাত্র। আমাদের কি ক্ষমতা যে, দৈবকার্য্য উদ্ধার করি। ইচ্ছাময়ী নিজ কার্য্য নিজে উদ্ধার করিবেন। আমি যে আজ অসময়ে এই আসনে আসীন হইয়াছি কেন, তা কি বুঝিতেছিস্ না? নর-

পশু আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে। ঐ দেখ! দেবীর লোল রসনা আরো বিলোল হইতেছে, করস্থিত কৃপাণ কাঁপিতেছে! ও সকল লক্ষণ কি বুঝিতে সাধকের বাকী থাকে?' এই মাত্র বলিয়া ব্রহ্মচারী আবার জপে বসিলেন। জামাই বাবু ভয়-বিহ্বল-নেত্রে একবার দেবীর প্রতি ও এক একবার ব্রহ্মচারীর প্রতি চাহিতে লাগিলেন।'

"সহসা তিনি 'গুরো! দেবী, সিংহ হইতে নামিয়াছেন, তিনি গৃহমধ্যে বেড়াইতেছেন।' এই কথা বলিয়াই পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা গেলেন। আমার হৃদয় প্রবল বেগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আমি বৃক্ষের শাখা ধরিয়াছিলাম, তথাপি বোধ হইল যেন আমি পড়িয়া যাই। আমিও চাহিলাম। দেখিলাম, যেন দেবী মূর্ত্তি দুলিতেছে, কিন্তু সেটী সামান্য ক্ষণের জন্য, পরক্ষণেই যেন সে চক্ষুর্ভ্রম অন্তর্হিত হইল। সিংহবাহনে সেই চতুর্ভুজা প্রশান্ত দেবী নিস্পন্দ নির্নিমেষলোচনা মন্দির আলো করিয়া বসিয়াছেন। সহসা ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া গভীর নাদে ঘণ্টা ধ্বনি, বনস্থলী কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনিত হইল।

"আমি হঠাৎ ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিলাম।

"ভাবিলাম যে, দূরে কি অন্য কোনও দেবালয় আছে? আশ্চর্য্য কি। আবার ঢং ঢং শব্দ সহ মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। তার পর দূরে দুই চারিটা মশালের আলোক দৃষ্ট হইল। ক্রমে আলোক সহ জনকোলাহল নিকটস্থ হইতে লাগিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ঐ বনমধ্যে ব্রহ্মচারী একা নহেন।

"দেখিতে দেখিতে আলোক সমূহ, মন্দিরের চতুর্দ্দিক সমালোকিত করিয়া উঠিল।

"পরক্ষণেই গেরুয়া বসন পরা এলোকেশী রুদ্রাক্ষকণ্ঠা ত্রিশূল-ধারিণী দ্বাদশটি ভৈরবী, কেহ বা পুষ্প কেহ বা রক্তচন্দন, কেহ বা বিল্বপত্র, কেহ বা নৈবেদ্যাদি লইয়া সেই প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। একে একে সকলেই পরিষ্কৃত শাণের উপর সকল দ্রব্যাদি স্থাপিত করিয়া করযোড়ে দেবীর প্রতি চাহিয়া স্তব করিতে লাগিল। স্তব সমাপনান্তে একে একে সকলেই সেই ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী চক্ষু খুলিয়া সকলকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া একজন অতি রূপলাবণ্যবতী ভৈরবীকে দেখিয়া লক্ষ করিয়া কহিলেন, 'বৎসে বিনোদিনি! প্রাঙ্গণে দেখ, চিরভীরু শরৎকুমার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, তোমরা সকলেই তার যাতে শান্তি লাভ হয়, কর। আর শরৎকুমার আজ নৃমুণ্ডমালিনীর সে শোণিত পার্ব্বণের প্রধান অভিনেতা।

সকল কয়টী ভৈরবীই জামাই বাবুর শুশ্রূষার কারণ উদ্যোগী হইল। কেহ তাহার মুখে শীতল বারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ বসিয়া উরুদেশ উপাধান করিয়া তার মস্তক তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল, কেহ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল। ব্রহ্মচারীর অনুমতি প্রতিপালন জন্য সকলেই চেষ্টিত হইল। সকলেই শাণের উপর ত্রিশূল রাখিয়া শরৎকুমারের সেবায় ব্যস্ত হইল। শুদ্ধ একটী যুবতী এক পাও উঠিলেন না। তিনি একদৃষ্টে দেবীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজ অভীষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ভৈরবী সকল স্থানান্তরে যাওয়ায়, তাঁকে আমি ভালরূপে দেখিতে পাইলাম। অন্যান্য ভৈরবী সকলেই রূপবতী, কেহ বা প্রৌঢ়া, কেহ বা মধ্যবয়স্কা কেহ বা

যুবতী; কিন্তু যিনি দাঁড়াইয়া অবিচলিত চিত্তে স্তব করিতে-ছিলেন, তাঁহার ন্যায় রূপবতী কেহই ছিল না।

"ব্রহ্মচারী তাঁহাকে ঐরূপ ভাবে থাকিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'গুরুর আদেশ কি, শৈলবালা শুনিতে পায় নাই?"

"শৈলবালা আপাদ লম্বিত কেশজালের মধ্য হইতে নির্ম্মল শরৎচাঁদের ন্যায় মুখোত্তলন করিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া মৃদুমধুর স্বরে উত্তর করিলেন, 'শৈলবালা গুরুর চরণে মতি স্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত আর কিছুই জানে না?"

"ব্রহ্মচারী আরো রুক্ষতর স্বরে কহিলেন, 'তবে শরৎকুমারের শুশ্রূষায় না গিয়া শৈলবালা এখনো ওরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া কেন?'

'এক জনের সেবায় একাদশ জন গিয়াছে, একজন না যাইলে, কি ক্ষতির সম্ভাবনা, বিশেষতঃ গুরুই আজ্ঞা দিয়াছেন যে, 'ভৈরবীগণের মনে যাহাতে জীবের প্রতি মায়া মমতা না থাকে, ততই ভাল; কেন না, অন্যের শারীরিক যন্ত্রণার পক্ষপাতী হইতে গেলেই মায়াভার চিত্তকে সংসারে আকর্ষণ করিয়া সংকল্পিত পুণ্যকার্য্যের ব্যাঘাত করে।' এই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া শৈলবালা নিরস্ত আছে। গুরুদেবের অন্য কোন আদেশ হইলে, দাসী করিতে প্রস্তুত আছে।'

"শৈলবালার উত্তরে ব্রহ্মচারী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তিনি দন্তদ্বারা অধর চাপিয়া ক্রোধ দমন করিলেন। শৈলবালা মস্তক নত করিয়া গুরুর অনুমতি অপেক্ষায় রহিলেন। ব্রহ্মচারী প্রকৃতিস্থ হইয়া 'ভাল বৎসে! উত্তম করিয়াছ। যাও, তুমি দেবীর পূজার আয়োজন করিয়া দাও।' ভৈরবী প্রাঙ্গণ হইতে চলিয়া

গেলেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে শুচি হইয়া ফিরিয়া আসিয়া একে একে সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপিত করিতে লাগিলেন।

"ইত্যবসরে ভৈরবীগণের যত্নে জামাই বাবুর পুনঃচেতনা প্রাপ্তি হইল।

"তিনি চতুর্দ্দিকে সুন্দরীগণের মূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ব ঘটনা-সমূহ স্বপ্নের ন্যায় বিবেচনা করিয়া স্থির হইলেন।

"ব্রহ্মচারী জামাই বাবুকে কহিলেন, 'বৎস! মানসিক শক্তির দ্বারা শারীরিক দুর্ব্বলতা হ্রাস কর। যাও, এক্ষণে স্নানপূর্ব্বক শুচি হইয়া আইস। শীতল জল সেচনদ্বারা মস্তক সুশীতল কর। দুই চারিটি কন্যা শরৎকুমারের সঙ্গে যাও।' এইমাত্র বলিয়া ব্রহ্মচারী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"ব্রহ্মচারী মন্দির মধ্যে গিয়া সকলকে বাহির করিয়া দিলেন।

"ভৈরবীগণ সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাত্রে সুগন্ধি ধুপ দীপ জ্বালিলেন।

"সমস্ত বনস্থলী মনোহর গন্ধে পরিপূর্ণ হইল।

"মন্দির মধ্যস্থিত যজ্ঞকাষ্ঠ জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। প্রথমে ধূমপুঞ্জে মন্দির ও চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হইল। উজ্জ্বল দীপ-শিখা সমূহ পর্য্যন্ত মলিন হইয়া আসিল।

"কিন্তু প্রভাতীয় তপন যেরূপ মেঘমালা ভেদ করিয়া, সহস্র কিরণ কণায় পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া সমুদিত হয়, সর্ব্বভুক্‌ও সেইরূপ ঐ ধূমপুঞ্জকে বিদূরিত করিয়া সামান্য কাল মধ্যেই নিজের সর্ব্বজনসংহারক নির্ম্মল তেজ বিকাশ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। দেব মন্দির এবং চতুঃপার্শ্বস্থ দালান ও বনের অনেক দূর পর্য্যন্ত সেই উজ্জ্বল প্রভায় আলোকিত হইয়া উঠিল।

"জামাই বাবুও সেই সুন্দরী ভৈরবীর দলমধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

"ক্রমে দেবালয়ে আরতি আরম্ভ হইল। দীপালোক, বদনমণ্ডলে পড়ায় যেন দেবীর মুখকান্তি আরও উজ্জ্বল হইল। ওষ্ঠাধরে যেন হাসির সঞ্চার হইল। কৃপাণপাণির কৃপাণ যেন কাঁপিতে লাগিল। আমি যে বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছি, সে ভাব ভুলিয়া যোড়করে দেবীর উদ্দেশে স্তব করিতে লাগিলাম।

"আরতি শেষ হইল। ব্রহ্মচারী যজ্ঞকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া রক্তজবা বিল্বপত্র ঘৃতে ভিজাইয়া আহুতি দিতে আরম্ভ করিলেন। হোমাগ্নি ঘৃতের সংযোগে ভয়ানক শিখা বাহির করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

"সেই হোমাগ্নির আলোক প্রভায় ব্রহ্মচারীকে যেন রামায়ণোল্লিখিত রাবণকুমার ইন্দ্রজিৎ বলিয়া বোধ হইল। তাঁর বিশাল বক্ষঃস্থল, বাহু ও ললাট রক্তচন্দনে লেপিত, অগ্নিতাপে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। ব্রহ্মচারী প্রকৃত রাক্ষসের ন্যায়ই শোভা পাইতে লাগিল।

"আমি যে কতক্ষণ এরূপ ভাবে ছিলাম, তা জানি না ; কিন্তু যখন ব্রহ্মচারী করযোড়ে দেবী চণ্ডিকার দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'মা চণ্ডিকে! তোর পূজায় যজ্ঞীয় আহুতি যে অসম্পূর্ণ থাকে! কৈ তোর পশু কৈ ? কাপালিকের পূজা তো নরশোণিত ব্যতীত সম্পূর্ণ হয় না। তবে কি তুই এই অধম ভক্তেরই মুণ্ড বাঞ্ছা করিস্ ?' এই কথা শুনিবামাত্র তখন আমার চৈতন্য হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার অবস্থা বড় ভয়ানক! কাপালিকের আচরণ যে দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহার

মনে যে বিন্দুমাত্র দয়ার বিদ্যমানতা আছে, তাহা বোধ হয় না। বিশেষ চণ্ডীপূজায় নরপশু অভাব। আমার গোপনীয় কার্য্য দেখিতে পাইলে, আর আমার জীবনের মূল্য এক পয়সাও নহে।

"ছেলে বেলা হতে কাপালিকদের নৃশংস ব্যবহারের কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু এখন চক্ষের উপর কাপালিক দেখিয়া, সেই পূর্ব্বের ভয় সহস্রগুণে বেড়ে উঠ্‌লো। আমি নিস্পন্দভাবে সেই বৃক্ষশাখার উপর থেকে আড়ালে আরো সঙ্কীর্ণভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম।

"ভীমকায় কাপালিক ঐরূপ বাক্যদ্বারা দেবী চণ্ডিকাকে তাড়না করিতে লাগিল।

"ভৈরবীগণও সেই সঙ্গে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সহসা দূরে রণবাদ্যের ন্যায় গভীর বাদ্যোদম হইল। কাহারও গৃহে ডাকাত পড়ার কালে যেরূপ শব্দে কাড়া ঢোল ঢাক একত্র বাজিয়া উঠে, সেইরূপ শব্দে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ভৈরবীগণের সহিত জামাইবাবু সত্রাসে উঠিয়া দাঁড়াইলে, দীপালোকে দেখিলাম, কাপালিকের মুখমণ্ডলে ভয়ঙ্কর হাসির সঞ্চার হইল।

"ঝড়ের ন্যায় দ্রুতগতিতে সেই বাদ্যধ্বনি নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন বাদকগণ অযথা বিলম্বের আশঙ্কায় দৌড়িয়া আসিতেছে।

"আমি মন্দিরের দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলাম। বাদ্যকরগণ আমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে আসিতেছিল। সহসা আমি মুখ ফিরাইয়া চাহিলাম। দেখিলাম, বনস্থলী বহুসংখ্যক মশালের আলোকছটায় দিবসের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কিন্তু গাছের আবরণ থাকায় জনসংখ্যা দেখিতে পাইলাম না।

"চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিয়া পুনর্ব্বার সেই ভয়ানক বাদ্যধ্বনি হইল এবং দেখিতে দেখিতে দ্বাদশজন সন্ন্যাসী ও কতিপয় চণ্ডাল-বেশী বাদ্যকর, উন্মত্তের ন্যায় সেই প্রাঙ্গণ-ভূমিতে আসিয়া উপনীত হইল।

"তাহার মধ্যস্থলে হস্তপদবদ্ধ একটী ষোড়শ বর্ষীয় অতি সুন্দর যুবা পুরুষ। তাহাকে বেষ্টন করিয়া বাদ্যকরগণ লম্ফ দিয়া বাজাইতে লাগিল। সন্ন্যাসিগণ দেবীকে প্রণাম করিয়া কাপালিকের চরণে প্রণত হইল।

"ঢং ঢং ঢং করিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে তিন বার একটী ভীম ঘণ্টা ধনিত হইল। সুগভীর ঘণ্টাধ্বনি হ'বামাত্রই সকলে এককালে নীরব হইল।

"এত জনের উপস্থিতিতেও সে স্থান এমনি নীরব যে, তার মধ্যে একটী সূচিকা পতনের শব্দও শোনা যায়।

"কাপালিক স্বাহা বলিতে বলিতে অনুমতি করিলেন, 'শীঘ্র যজ্ঞীয় পশু হোমকুণ্ডের নিকট স্নান করাইয়া আনয়ন কর।' চারিজন সন্ন্যাসী, সেই বন্দী যুবকের হস্ত ধরিয়া প্রাঙ্গণ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেল।

"কাপালিক পুনশ্চ কহিলেন, 'চণ্ডালগণ! নরপশু বলিদানের আর আর উদ্যোগ কর। আজ দেবীর প্রসাদে তোরা উদর পূরিয়া সুধাপানের আনন্দ অনুভব করিবি, শীঘ্র তার আয়োজন কর।'

"চণ্ডালগণ বাদ্যযন্ত্র ভূতলে রাখিয়া, সেই চালার মধ্যস্থ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল ও আটজনে ধরাধরি করিয়া এক প্রকাণ্ড হাড়িকাঠ আনিয়া বসাইবার কারণ গর্ত্ত খনন করিতে লাগিল।

"কিয়ৎক্ষণের পর মধ্যেই দৃঢ়রূপে দেবীর সম্মুখে সেই হাড়িকাঠে বসান হইল। এক প্রকাণ্ড তীক্ষ্ণধার খড়্গ সিন্দূর সজ্জিত করিয়া তাহার পার্শ্বে রাখা হইল।

"কাপালিক অন্যান্য সন্ন্যাসীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, 'তোমরা আর আর কেহ গিয়া সুধাভাণ্ড আনয়ন কর।'

"দুই তিন জন সাধক মন্দিরের সম্মুখের চালাগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটা মাটীর সুরাপূর্ণ কলস আনিয়া, সেই মন্দিরের দাওয়ায় রাখিয়া দিল।

"কাপালিক মন্ত্রদ্বারা সুরাপাত্র দেবীর উদ্দেশ নিবেদন করিয়া দিলেন।

কোশা পূর্ণ করিয়া হোমাগ্নিতে সুরা আহুতি পড়িতে লাগিল। সর্ব্বভুক্-শিখাও মদিরা পানে উন্মত্তের ন্যায় এ দিক ও দিক্ করিয়া টলে টলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। চণ্ডালগণও ঐ সময়ে ভয়ানক বাদ্যধ্বনি করিয়া উঠিল।

কাপালিক ত্রস্ত হস্তে ভৈরবী, সন্ন্যাসী ও বাদ্যকর সকলকেই দেবীর প্রসাদী সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিন চার পাঁচ পাত্র করিয়া সুধা, সেবক সেবিকাগণকে বিতরিত হইল। এমন সময় কাপালিক বাদ্যধ্বনি বন্ধ করিয়া জামাইবাবুর প্রতি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'প্রিয় শিষ্য শরৎকুমার! দেবীর আদেশ হইয়াছে যে, তুমি স্বহস্তে নরপশু বলি দিয়া জগন্মাতার শোণিত-পার্ব্বণ রক্ষা কর।'

"জামাই বাবু একেবারে বজ্রাহত পাদপের ন্যায় ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে থাকিয়া কহিলেন, 'গুরুদেব! যদ্যপি প্রাণ যায়, সেও শ্রেয়ঃ, তত্রাচ নৃশংসতার চূড়ান্ত নরহত্যা আমার দ্বারা

হইবে না।' কাপালিকের বিশাল চক্ষু একেবারে জবাফুলের ন্যায় হইয়া উঠিল। গুরুর কোপ দর্শনে অন্যান্য সকলেই মাথা হেঁট করিয়া রহিল। চণ্ডালগণ পর্য্যন্তও মুখ চাওয়া চাওয়াই করিতে লাগিল।

"কাপালিক স্থির গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'হাঁরে মূঢ়! গুরুর আদেশ অবহেলার যে কি বিষময় ফল, তা জানিস্? হাঁরে! সে সকল কি তোর স্মরণ নাই?' জামাই বাবু কহিলেন, 'উত্তম স্মরন আছে, কারাবদ্ধ অপেক্ষা আরো কোন কঠিনতর দণ্ড নিতেও আমি অস্বীকৃত নই; কিন্তু নিজ হস্তে জল্লাদের ন্যায় নরহত্যা করিতে পারিব না এবং করিবও না।'

"কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। দৃঢ় মুষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গ খানা একবার ধরিয়া তুলিলেন? কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া তাহা ফেলিয়া দিয়া বজ্রনাদে কহিলেন, 'অরে চণ্ডাল গণ! চিরপরিচিত কারাগার মধ্যে এই শিষ্যাধমকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখে আয়।'

"চারি জন চণ্ডাল নক্ষত্রবেগে জামাই বাবুর দিকে ছুটিল। তিনি একবার আপত্তি করিবার আশয়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেই অসুরের ন্যায় বলবান্ চারিজন চণ্ডালের সহিত একা কি করিতে পারিবেন! তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

"শিষ্যগণের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধির কারণ পুনর্ব্বার মদিরা দেওয়া হইল।

"স্ত্রী পুরুষ সকলেরই উজ্জ্বল চক্ষু, অস্থির হস্তপদ ও বাক্পটুতায় উন্মত্ততার উত্তম চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল, বাদ্যকরগণও দেবীর সুধা প্রসাদে বঞ্চিত হইল না।

"ক্ষণকাল কাপালিক নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, 'শিষ্যগণের মধ্যে দেবীর শোণিত-পার্ব্বণে আজ কে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হইবে ?"

"সকলেরই বদন বিষণ্ণ হইল। ভৈরবীগণ প্রসাদী সুরার, তেজেই হউক বা ভয়েই হউক, সকলেই এককালে চক্ষু নিমীলিত করিল।

"কেহই গুরুর কথায় উত্তর দিল না। কাপালিক পুনশ্চ কহিলেন, 'এত সংখ্যক নরনারীর মধ্যে দেবীর কার্য্য করিতে কি কেহই নাই ? সকলেই সংসারের দাস দাসী ! আমি আজ জানিলাম যে, আমার সকল শ্রমই পণ্ড হইয়াছে।' এইমাত্র বলিতে বলিতে কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে কম্পিত ও প্রলম্বমান হইতে লাগিল। সহসা ভৈরবীদলেরমধ্যে জনৈকা, রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"ধীরে ধীরে পাদক্ষেপণপূর্ব্বক রমণী কাপালিকের চরণে গিয়া প্রণত হইল।

"ভৈরবী মাথা তুলিবামাত্র দীপালোক তাহার মুখে পড়িল। দেখিলাম, সেই ভৈরবী সুন্দরী শৈলবালা ! শৈলবালার বক্তব্য শুনিবার কারণ কাপালিক ইঙ্গিত করিলেন। শৈলবালা কহিল, 'গুরো ! রমণী বলিয়া যদ্যপি আপত্তি না থাকে, তবে আমায় একটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে, আমি গুরুর আজ্ঞা ও দেবীর কার্য্য উভয়ই সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।'

কাপালিক সাদরে কহিলেন, 'বৎসে ! তোমার সাহস দর্শনে ও মধুমাখা বাক্য শ্রবণে আমি যার পর নাই প্রীত হইয়াছি। তোমার কি বরের প্রয়োজন ব্যক্ত কর, আমি দিতে অস্বীকার করিব না।' শৈলবালা নতমুখে বলিল, 'গুরো ! আমি আপনার

আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে, আপনি শরৎকুমারকে কারামুক্ত করিবেন, এই মাত্র আমার ভিক্ষা, আর কিছুই নয়।

কাপালিকের গম্ভীর বদনের অধর প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য হাসির রেখা দেখা দিল; কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব অদৃশ্য হইয়া গেল।

"কাপালিক পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল স্বরে কহিলেন, 'বৎসে! আমি বুঝিলাম যে, তুমিই আমার যথার্থ শিষ্য ও দেবীর প্রকৃত ভক্ত। কার্য্যকালে জগদম্বা তোমার বাহুতে আসুরিক বল দিবেন। তোমার বাঞ্ছিত বর দিতে আমি স্বীকৃত হইলাম। দেবীর প্রসাদী সুধাপান করিয়া চিত্তকে পবিত্র কর; কারণ, কার্য্যকাল অতি সুনিকট হইয়া আসিতেছে।' এই বলিয়া কাপালিক ভৈরবীর মস্তক চুম্বন করিয়া, চণ্ডীর দিকে চাহিলেন। আমিও বৃক্ষশাখা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম।

পাষাণময়ী দেবী দীপালোকে উদ্ভাসিত শ্রীমুখমণ্ডলে যেন হাসির আভাস স্পষ্ট দেখা গেল।

"এমন সময় চণ্ডালগণ সেই নরপশু যুবাকে আর্দ্রবসনে বধ্য-ভূমি মধ্যে লইয়া প্রবেশ করিল। যুবকের মুখশ্রী ঈষৎ মলিন; কিন্তু চিত্তের ধৈর্য্যগুণে সমস্ত প্রকৃতি স্থির। ভয় কিম্বা বিষাদের চিহ্নমাত্রও নাই।

"আসন্ন বিপদ্ নিকট ভাবিয়া ও নিজ অকাল মরণের বহুবিধ উদ্যোগ দেখিয়াও তার বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব নাই। এত শৈশবে এতদূর মহত্ত্ব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। চণ্ডালগণ তাহাকে মন্দিরের দালানের উপর উঠাইল। তাহার ললাটে দেবীর প্রসাদী সিন্দূর দেওয়া হইল। একপাত্র সুরার সহিত নৈবে-

ন্তের কিঞ্চিৎ ফল মূল তাহাকে দেওয়া হইল। যুবকের যদিও হস্তপদ বাঁধা ছিল, তত্রাচ তিনি সে সকল ফেলিয়া দিলেন। কাপালিক শৈলবালাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিতে বলিয়া, মন্ত্রটী পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রপাঠ শেষ হইবামাত্র কোন অদৃশ্য স্থান হইতে ঢং ঢং শব্দে নৈশাকার ভেদ করিয়া সুগভীর ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। ভৈরব ভৈরবী সকলেই চমকিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাদ্যকরগণ সকলে নিজ নিজ যন্ত্রাদি লইয়া হাড়িকাঠের চতুস্পার্শে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইল। হোমাগ্নির উপর রাশি রাশি গন্ধদ্রব্য দেওয়ায়,মন্দির ও বহির্দ্দেশ সৌরভে পূর্ণ হইল। শৈলবালা দৃঢ়রূপে কটীদেশে বস্ত্র বাঁধিয়াছে, এলায়িত কেশগুলিও সংযত করিয়াছে। শৈলবালা নিশ্চল, অধর দন্তে চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মন্ত্র শেষ হইবামাত্র ভৈরবী দৃঢ়মুষ্টিতে খড়্গ তুলিয়া লইল।

"ভয়ঙ্কর কাল !

"সহসা সেই ধীরপ্রকৃতি মরণ কালেও বলীয়ান বন্দী যুবকের প্রতি শৈলবালার দৃষ্টি পড়িল।

পথিমধ্যে করাল কালসর্প ফণা উন্নত করিয়া দংশন করিতে আসিতেছে দেখিয়া, পান্থ যেরূপ মহাত্রাসে চলৎশক্তি রহিত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, ভৈরবীও সেই বন্দীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তদ্দশাপন্না হইল; কিন্তু সেটী অর্দ্ধ নিমিষের কারণ।"

"পর মুহূর্ত্তেই ভৈরবী দক্ষিণ হস্তে সেই সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ঘূর্ণিত করিয়া ও বামহস্তে সেই যুবকের কটীদেশ ধরিয়া মন্দির হইতে লাফাইয়া পড়িল ও চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে তাহাকে

লইয়া তীরবেগে পার্শ্বস্থ অরণ্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিমিষ মধ্যে সকলের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

"সকলে স্তম্ভিত হইয়া চিত্রিত পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল কেহ তাহাদের গতিরোধ করিতে পারক হইল না।"

* * * * *

"সর্ব্ব প্রথম কাপালিক বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইলেন।

"ক্রোধে তাঁহার মুখ হইতে ফেণরাশি বাহির হইতে লাগিল।"

"তিনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, 'ভীরু কাপুরুষগণ! একটা স্ত্রীলোককে বাধা দিতে কেহই পারিল না? তোদের জীবনে ধিক্! তোদের পুরুষত্বে ধিক্! সকলে আমার কথা শোন্, যে কেহ উপপতির সহিত কুলটাকে এই দণ্ডে ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি দেবীর ধনাগার হইতে স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিব। কুলটা এখনও অধিক দূরে যাইতে পারে নাই। চেষ্টা করিতে পারিলে, এখনি ধৃত হইবে।' মন্দিরের চারিদিকে মশাল জ্বলিতেছিল, ভৈরব ভৈরবী ও চণ্ডাল সকলেই একটা একটা করিয়া হস্তে লইয়া বনের চতুর্দ্দিকে প্রবিষ্ট হইল। মন্দির মধ্যে শুদ্ধ কাপালিক একা রহিলেন।

"ইচ্ছাসত্বেও আমি প্রাণভয়ে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে পারিলাম না। জড়ের ন্যায় আমি সেই শাখা ধরিয়া বসিয়া রহিলাম।

"বনের চতুর্দ্দিকেই মশাল জ্বলিতে লাগিল। চণ্ডাল ও ভৈরব ভৈরবী সকলেই চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কেহই আর ফিরিল না। ক্রমে আলোক সমূহ হীনজ্যোতি হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বন আরো প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইল। কাপালিক

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বল্পকাল মধ্যেই এক হস্তে এক খানা প্রলম্বমান্ অসি ও অন্য হস্তে একটী আলোক লইয়া বাহিরে আসিলেন।

" দেবীর দিকে চাহিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে কি কহিলেন এবং পরক্ষণেই দ্রুতপদে বনের অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"মন্দির ও প্রাঙ্গণ জনশূন্য হইবামাত্র আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম।

"ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিলাম, মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেবীর প্রসাদী ফল মূল ও মিষ্টান্ন যাহা পারিলাম, তাহা উদর পূর্ণ করিয়া খাইলাম।"

"কাপালিকের যেরূপ নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়াছিলাম, তাহাতে মন্দির বা ঐ চালার মধ্যে থাকিতে সাহস হইল না। .

"মন্দিরের কিছু দূরে একখানি ভগ্ন কুটীর দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সেই কুটীরাভিমুখে যাইলাম। সেই গৃহ মধ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ্ শুস্ক তৃণ ছিল। অতি সাবধানে সেই তৃণরাশির মধ্যে গুপ্তভাবে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম। প্রভাত হইল, ছদ্মবেশে জামাই বাবুর কারাবাস স্থান অনুসন্ধান করিব, ইহাই স্থির করিলাম।'

"এই পর্য্যন্ত বলিয়া সনাতন শ্বাসত্যাগ করিল। বাবা ও আমি উভয়েই কাপালিক সম্বন্ধীয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। সনাতন নীরব হওয়াতে আমাদের মোহ ভাঙ্গিল। বাবা অধীর হইয়া বলিলেন, 'সনাতন! তোমার মুখে যা শুনিলাম, তা আমি দেহ ধারণে কখন শুনি নাই। আমি বুঝিলাম যে, শরৎকুমার নৃশংস কাপালিকের কুহকে পড়িয়া

সরলাকে অযত্ন করিয়াছে। এক্ষণে তার কারাবাস স্থান দেখিয়া আসিয়াছ কি না? তাকে উদ্ধার করিতে পারিব কি? না হত-ভাবিনী সরলার কপাল জন্মের মত পুড়িয়া গিয়াছে।' সনাতন বলিল, 'আমি পরদিন হইতে ভিক্ষুকের বেশ ধরিয়া বনের সকল স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক তাঁহার কারাবাস স্থান নির্ণয় করিয়াছি। ঐ সূত্রে দুই তিনবার কপালিকের সম্মুখে পড়িয়াছি;' কিন্তু আমাকে ভিক্ষুক জ্ঞানে তিনি কিছু বলেন নাই। প্রহরী পরি-রক্ষিত দেবীদুর্গ নামক স্থানে তাঁকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।'

"বাবা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'সনাতন। কাল প্রাতেই শরৎকুমারের মুক্তির জন্য আমরা লোকজন লইয়া যাত্রা করিব। তুমি এক্ষণে গিয়া শয়ন কর। আমি সর্দ্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাখি।'

"এই বলিয়া বাবা কাছারী বাটীর দিকে গেলেন। সনাতনও নিজ বাস ঘরে চলিয়া গেল।

"আমি একমনে সেই বাতায়নের নিকটে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম। কত কি ভাবিলাম, তার আর স্থির নাই। শেষে মনে মনে এইটী ঠিক্ করিলাম যে, আমি বাবার সঙ্গে অবশ্য অবশ্যই যাইব, কোন আপত্তি শুনিব না। নাথকে উদ্ধার করিব, আর সুন্দরী ভৈরবী শৈলবালার কি হইল, সেইটীও জানিবার কারণ মন বড় চঞ্চল হইল।

"অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া দেহ অবসন্ন হইয়াছিল। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র ঘুম আসিল। ঘুমের ঘোরে সেই বন্দী যুবা ও শৈল-বালার

"ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাবা শিয়রে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন, 'ওমা সরলা! একবার ওঠ্ তো মা!'

"আমি চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলাম।

"বাবা বলিলেন, 'আমরা এক জায়গায় যাচ্ছি, কাল আসিব; তুই একলা থাকৃতে পার্‌বি?'

আমি। না।

বাবা। তবে কি হবে?

আমি। তুমি আমায় সঙ্গে নে যাবে।

বাবা। দূর্ পাগলি! তুই কি আমার বেটা ছেলে?

আমি। আমি তোমার মেয়ে ছেলে।

বাবা। তবে তুই যাবি কেমন করে?

আমি। তোমার সঙ্গে পাল্কি করে।

বাবা। এ নেমন্তন্ন নয় মা, কোথা যাব জানিস্?

আমি। জানি।

বাবা। কি করে জান্‌লি?

আমি। শুনে।

বাবা। কি কর্ত্তে যাচ্চি?

আমি। যুদ্ধ করতে।

"বাবা বাম হস্ত দিয়া আমার মুখখানি তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর বলিলেন;—

'আমি যুদ্ধ কর্ত্তে যাচ্চি, তুই কি করে শুন্‌লি?

"আমি। তোমাতে সনাতন দাদাতে রাত্রে বাগানে যত কথা কহিয়াছ, আমি জানালায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিয়াছি।

বাবা। গোপনীয় কথা কি শুন্‌তে আছে পাগলি? তাতে পাপ হয় জানিস্?

আমি। অন্যের কথা হলে শুনিতাম না, নিজের ব'লে শুনিয়াছি।

বাবা। যা হ'ক, তোর যাওয়া হবে না মা।

আমি। আমায় যেতেই হবে বাবা।

বাবা। সে বড় সঙ্কটের স্থান, শুনেছিস্ তো?

আমি। বাবা কাছে থাকিলে, কোন সঙ্কটেই ভয় করি না।

বাবা। তোকে কথনই আঁট্‌তে পার্‌লেম না।

আমি। আমি যে আঁট্‌বার মেয়ে নই বাবা!

"বাবা হাসিতে হাসিতে বাহিরে গিয়া আর একথানা পাল্কি আনিবার হুকুম দিলেন।

"এক ঘণ্টার ভিতর কাছারী বাটীতে সমস্ত জিনিষ পত্র মজুত হইল।

"দুই শত ঢাল তলোয়ারধারী পাইক, বরকন্দাজ পঁচিশ জন, রায়বেঁশে আটজন, পাচক ব্রাহ্মণ ও অনেক খাদ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে চলিল।

"সূর্য্য উদয় হয়, এমন সময়ে আমরা সকলে যাত্রা করিলাম।

"বাবার ও আমার পাল্কির পাহারা দিবার কারণ কুড়িজন স্বতন্ত্র ভোজপুরে দরওয়ান চলিল।

"বেলা ১০ টার সময় আমরা সেই সনাতন-কথিত নদীতীরে আসিলাম।

"দেখিলাম, সেই চাবি দেওয়া গৃহ মধ্যে আমাদের ঘোড়া রহিয়াছে।

"বাবার হুকুমমাত্র চাবি ভাঙ্গিয়া লোকে সেই ঘোড়া বাহির করিয়া নিল। কাষ্ঠের ভেলা করিয়া সকল সৈন্য পার হইল। ক্রমে আমরা নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

"আমার মনে বড় উৎসাহ হইল। প্রাণেশ্বর সহ সেই শৈলবালা ও সেই বন্দী যুবককে সঙ্গে করিয়া আনিব। যদিও পাইকগণ খুব দ্রুতপদে যাইতেছিল, তত্রাচ আমরা বেলা চারিটার সময় সেই দেবী চণ্ডিকার মন্দিরের প্রাঙ্গণে যাইয়া উপনীত হইলাম।

"আমরা পাল্কি হইতে নামিয়া মন্দির মধ্যে দেবী দর্শন করিলাম ও সনাতন যেরূপ বলিয়াছিল, সেই ভাবে সমস্ত জিনিষ পত্রাদি ছড়ান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণে বলিদানের হাড়িকাঠ পর্য্যন্ত বসান রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া সনাতন বাবাকে কহিল, 'সেই রাত্রি পর্য্যন্ত কেহই আর এখানে আইসে নাই, বোধ হইতেছে।'

"বাবা বলিলেন, 'আইসে নাই বটে, কিন্তু আসিবার সম্ভাবনা যায় নাই। অগ্রে সেনাগণের আহারাদি হউক, তার পর যথাকর্ত্তব্য পরামর্শ স্থির করা যাইবে।'

"ব্রাহ্মণগণ সেই চালার মধ্যে রন্ধন আরম্ভ করিল।

"হঠাৎ শত্রুদল আসিয়া না পড়িতে পারে, তন্নিবারণ জন্য চারিদিকে পাহারা বসান হইল।

* * * * *

"সন্ধ্যার সময় আমরা মন্দিরের চাতালে শয্যা বিছাইয়া বসিলাম। সকলের আহারাদি হইয়াছে, এমন সময় এক জন চণ্ডালের ন্যায় বন্দী ব্যক্তি আনীত হইল।

"অনেক ভয় প্রদর্শন করায়, তাহার নিকট জানা গেল যে, 'সেই রাত্রি পর্য্যন্ত কেহই আর চণ্ডিকার মন্দিরে আইসে নাই। বন্দী যুবকের সঙ্গে ভৈরবী শৈলবালার আর কোন উদ্দেশ হয় নাই। ভৈরব ভৈরবীগণ সহ কাপালিক দেবীদুর্গে অতি নিভৃত ভাবে অবস্থান করিতেছেন।'

"এই পর্য্যন্ত বলিয়া বন্দী নীরব হইল। বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চণ্ডিকার শোণিত-পার্ব্বণের রাত্রে শরৎকুমার নামক এক শিষ্যকে যে বন্দী করা হইয়াছিল, সে বন্দী কোথায়?' চণ্ডাল, বাবার প্রশ্নের কোন উত্তর না করিয়া নীরব হইয়া রহিল।

"সকলের মনে মহা সন্দেহের উদয় হইল হইল।

বাবা ক্রোধিত হইয়া কহিলেন, 'শোন্ দুর্ম্মতি! কাপালিকের দাস! যদি প্রাণের আশা থাকে, তো শরৎকুমারের কি হইয়াছে বল্; নতুবা, এই দণ্ডেই ঐ হাড়িকাঠে তোর বধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেবীর অসম্পূর্ণ শোণিত-পার্ব্বণ পুর্ণ করিব।' বন্দী কাতর স্বরে কহিল, 'বলিবার আদেশ নাই।'

"বাবা চারিজন পাইককে কহিলেন, 'এই দুরাত্মাকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া ওর মস্তক ছেদন কর।'

বাঘের ন্যায় চারিজন সেনা, বন্দীর হাত পা বাঁধিয়া হাড়িকাঠের মধ্যে ফেলিল। তখন বন্দী বলিল, 'বলিতেছি, ছাড়িয়া দাও।'

"বাবা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন। বন্দীকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল। বাবা অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন যে, 'তোর বলিবার বিলম্বে যদ্যপি শরৎকুমারের কোন বিপদ্ ঘটে, তা হলে, তোর কিছুতেই নিস্তার নাই। কি বলিবার আছে, শীঘ্র বল্।'

"চণ্ডাল কহিল, 'যে রাত্রি হইতে নরপশুর উদ্ধার করিয়া ভৈরবী শৈলবালা পলায়ন করিয়াছে, সেইক্ষণ হইতে শরৎকুমার কাপালিকের ভয়ঙ্কর ক্রোধে পতিত হইয়াছেন। গুরুদেব বলেন যে, যদ্যপি ঐ ভীরু সেই রাত্রে ঐ নরপশুর বধকার্য্য সমাধা করিয়া তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করিত, তাহা হইলে, আর এ দুর্ঘটনা ঘটিত না; অতএব, ঐ দুরাত্মার কারণ দেবীর ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। সেই জন্য, উহাকে বলিদান দেওয়া ব্যতীত দেবীর ক্রোধ শান্তির উপায় নাই। তাই কাল রজনীতে দেবীদুর্গ মধ্যে ছিন্নমস্তার প্রীত্যর্থে শরৎকুমারের বলি হইবে।'

"সমস্ত সেনাগণ ক্রোধে গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল ও সদর্পে কহিল, 'সনাতন! কোথায় সেই দেবীদুর্গ এবং কোথায় সেই কাপালিক ও তদনুচরগণ? শীঘ্র দেখাইয়া দিবে চল। আমরা এই দণ্ডে তার শোণিত মাংস শৃগাল কুক্কুরকে ভক্ষণ করাইয়া ক্রোধের শান্তি করিব।'

"বন্দী কহিল, 'দেবীদুর্গে প্রবেশ করা নিতান্ত সহজ কথা নয়, দুর্গ ও ভাণ্ডার রক্ষার জন্য প্রায় সেখানে শত শত সুশিক্ষিত সৈন্য আছে, তাহাদের অধিকাংশই ধানুকী ও মল্ল; অতএব, সাবধানে যাওয়া উচিত। তাহারা আপনাদের আগমন বার্ত্তা পাইলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে।'

"বন্দীর পরামর্শ যুক্তিসঙ্গত ভাবিয়া তথায় প্রচ্ছন্নভাবে যাওয়াই স্থির হইল।

দেবীদুর্গে—যুদ্ধের পরিণাম।

"দুই চারি পলকের মধ্যে শত শত মশাল জ্বলিয়া উঠিল।

"পথ দেখাইবার কারণ বন্দীকে সঙ্গে লওয়া হইল।

"নিবিড় বন মধ্য দিয়া সেনাদল নিস্তব্ধে চলিল।

"দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টার মধ্যে চারি ক্রোশ পথ উত্তীর্ণ হইলাম। বন্দীর যুক্তি অনুসারে দুই চারিটী আলো ব্যতীত সমস্ত আলো নির্ব্বাপিত করিয়া অন্ধকারে সেনাবৃন্দ চলিল।

"ক্ষণকালের মধ্যে অন্ধকারে আমিও দিব্য চক্ষুর্জ্যোতি লাভ করিলাম।

"ক্রমে সুদূরস্থিত আকাশপটে উচ্চ মন্দিরের চূড়াসমূহ দেখিয়া বোধ হইল যে, আমরা দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। ক্রমে দূরের আলোকমালা দেখিয়া, বাবা বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও সমস্ত কিসের আলো?

"বন্দী কহিল, 'দেবীদুর্গের পরিখার জন্য ফুল সকল প্রত্যহ রজনীতে আলোক মালার ন্যায় সজ্জিত হয়।'

"পরিখার নাম শুনিয়াই বাবা সনাতন ও অন্যান্য সর্দ্দারগণের সঙ্গে কি গোপনে পরামর্শ করিলেন।

"পরক্ষণেই, কুড়ি পঁচিশ জন পাইক লইয়া দুইজন সর্দ্দারের সঙ্গে সনাতন দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিল।

"বন্দীর যুক্তি অনুসারে পরিখার নিকটবর্ত্তী একটী মাটীর গৃহ মধ্যে আমার শিবিকা রাখা হইল। রক্ষার কারণ কুড়িজন অস্ত্রধারী নিকটে রহিল। বাবা স্বয়ং সেনা সমাবেশ করিলেন।

সেনাগণ অন্ধকারে নীরবে অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"দুই দণ্ডের মধ্যে একটী উচ্চ তূর্য্যধ্বনি হইল এবং পরক্ষণেই হর হর বম্ বম্ শব্দে নৈশাকাশ ভেদ করিয়া আমাদের সেনাদল দুর্গাভিমুখে ছুটিল।

"বাবার অনুমান সফল হইয়াছে। পরিখার সেতুরক্ষক সেনাগণ শত্রুর সমাগম না জানিয়া অসতর্ক ছিল, সনাতন ও তদনুসঙ্গী সেনাগণ সহজেই তাহাদিকে পরাজিত করিয়া দুর্গদ্বার অধিকার করিয়া তূর্য্যধ্বনি দ্বারা ইঙ্গিত করিল।

"অন্ধকারের সাহায্যে প্রায় আমাদের সকল সৈন্যই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল।

"দুর্গস্থ সেনাগণ অধিকাংশই নিরস্ত্র থাকায়, অধিকাংশ সৈন্য হতাহত হইল।

"হর হর বম্ বম" শব্দে দুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"বাহকগণ আমার শিবিকা লইয়া দ্রুতপদে দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

"তখন আমি সমস্ত চাক্ষুষ দেখিতে পাইলাম। দুর্গমধ্যে চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়াছে; আহত সেনাগণের আর্ত্তনাদে কোথাও বা কর্ণপাত করা যায় না; কোথাও বা ভৈরব ভৈরবী-গণ উন্মত্ত অবস্থায় উলঙ্গ হইয়াই পলাইবার উপক্রম করিতেছে; কোথাও বা কেহ করযোড়ে প্রাণভিক্ষা চাহিতেছে।

"এমন সময় বাবা ও সনাতন রক্তাক্ত কলেবরে অসি ধারণ পূর্ব্বক আমার শিবিকার নিকট আসিয়া আমার কুশল সমাচার লইলেন।

"এমন সময় একজন পাইক আসিয়া বাবাকে কহিল, 'শীঘ্র আসুন! জামাই বাবুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং সেই দুরাত্মা কাপালিকও সেই স্থানে আছে।' বাবা ও সনাতন তার সঙ্গে নক্ষত্রবেগে চলিলেন। আমিও রক্ষকগণকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া বাবার পিছু পিছু ছুটিলাম। কিছুদূর যাইয়াই তাঁহারা একটী বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

"বাড়ীটীর মধ্যে ঘোর অন্ধকার। কোন দিকে একটীও দীপ নাই। আমরা সকলেই নীরব হইয়া দাঁড়াইলাম। সহসা সজোরে একটী দ্বার খোলা হইল। সুগভীর স্বরে এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধভাবে কহিল, 'কে আছিস্ রে! শীঘ্র ছিন্নমস্তার প্রীত্যর্থে দুষ্টবুদ্ধি শরৎকুমারের বলির উদ্যোগ কর্।'

"চারিদিক্ হইতে "হর হর বম্ বম্" শব্দ উত্থিত হইল।

"বাবা উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'দুরাচার কাপালিক! তোর দুষ্ট অভিসন্ধি পূর্ণ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। দেবীদুর্গ এক্ষণে তোর শত্রু হস্তে পতিত।'

"এমন সময় গৃহমধ্য হইতে নাথ কাতরস্বরে কহিলেন, ' নিকটে বন্ধু আছ? রক্ষা কর! প্রাণ যায়! জল দাও!'

"সকলেই সেই দিকে ছুটিল। কিন্তু কেহ প্রবেশ করিতে ন করিতে দুষ্ট কাপালিক এক গণ্ডুষ জল হস্তে লইয়া কি মন্ত্র পড়িয় নাথের গায়ে ছড়াইয়া দিল; আর তিনিও দেখিতে দেখিতে শুক-পক্ষীর বেশ ধারণ করিলেন। বাবা ও সনাতনকে অসিহস্তে ধাবিত হইতে দেখিয়া, দুষ্ট কপালিক বেগে জানালা দিয়া বাটীর

বাহিরে লম্ফ দিয়া পড়িলেন। আমি দৌড়িয়া গিয়া সর্ব্বস্বধন পতিকে বুকে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

"কাপালিকের অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিকী ক্ষমতা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিল। দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাবার মোহ ভাঙ্গিল। তিনি সনাতনকে কহিলেন, 'যার উদ্ধারের কারণ এতক্ষণ এত সহিলাম, দুরাত্মা কাপালিক তাহার কি দুর্দ্দশা করিল, তাহা স্বচক্ষে দেখিলে! এক্ষণে আর কাহারও সম্মানের অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। দেবীদুর্গ ভাণ্ডারে বহু ধনরত্ন আছে, সেই সমস্ত লুণ্ঠন কর। আর দুষ্ট কাপালিক যে কোথায় লুকাইয়াছে, সর্দ্দারগণকে তাহার তত্ত্ব লইতে বল।' সেনাগণ "হর হর বম্ বম্" শব্দে চারিদিকে ধাবিত হইল। আমিও বাবার সহিত সেই প্রাণের পক্ষী লইয়া ধীরে ধীরে চলিলাম। ছিন্নমস্তার মন্দিরের রোয়াকের উপর আমরা আসিয়া দাঁড়াইলাম। দুই চারি দণ্ড মধ্যে সেনাগণ ভারে ভারে মুদ্রা ও অন্যান্য রত্নাদি আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল।

"কাপালিকের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। তাহার সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি সকলেই দুর্গ হইতে বিতাড়িত হইল।

"বাবার আদেশে দুর্গের প্রবেশ ও প্রস্থানের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করা হইল।

"দেবীদুর্গ আমাদের সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত হইল।

"ছিন্নমস্তার মন্দিরের রোয়াকে শত শত মশাল জ্বালা হইল। নাথের রক্ষার কারণ ভাণ্ডার হইতে এই স্বর্ণময় খাঁচাটী আনা হইল।

"সকলেই বিরসবদনে কি হইবে, এই বিষম সমস্যা ভাবি-

তেছে, এমন সময়ে একটী বিষময় তীর আসিয়া বাবার হৃদয়ে সতেজে বিদ্ধ হইল।

"বাবা আন্তরিক কাতরোক্তি করিয়া ভূতলে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। সকলেই "হা হতোস্মি!" করিতে লাগিল। কোথা হইতে তীর আসিল, দেখিবার কারণ চারিদিকে পাইকগণ ছুটিল। বিবিধ প্রকার চেষ্টাতেও তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে শরফলা বাহির হইল না।

"ক্ষণকাল মধ্যে আমার কোলে মাথা রাখিয়া বাবা পঞ্চত্ব পাইলেন। সেই সঙ্গে হতভাগিনীর সকল আসা ভরসা জন্মের মত অতল জলে ডুবিল।

"দেবীদুর্গ মধ্যে বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া আমি চক্ষের জল মুছিয়া এই প্রাণের পাখী লইয়া নিশীথ কালে কাহা-কেও কিছু না বলিয়া দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলাম। তখন আমার মস্তকে জলন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল। সেই পর্য্যন্ত আমি সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিতেছি।

"দেবীদুর্গ বোধ হয়, সনাতন ও আমাদের সেনাগণের অধীনে আছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া ভিখারিণী প্রচুর পরিমাণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

ভিখারিণীর রহস্যময় বৃত্তান্ত শুনিয়া যে কত কি ভাবিলাম, তাহার আর স্থিরতা নাই। আমি করুণস্বরে বলিলাম, মা! এ পর্য্যন্ত জামাতার উদ্ধারের জন্য কি কোন উপায় করিতে পারিন্ নাই? ভিখারিণী বলিল, "না মা! কত ঋষি কত তপস্বী কত সন্ন্যাসী কত যোগীর কাছে চেষ্টা পাইয়াও সফল হই নাই; তবে দেখি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি কখনও সিদ্ধকাম হই।"

আমি বলিলাম, মা! আর তোমার কোথাও যাইতে হইবে না। আমার মেয়ে চিরকাল আমার কাছে থাকিবে। জামাতার দেহ পুনঃ পাইবার উপায় আমিও বিধিমতে দেখিব। ভিখারিণী আহ্লাদে গদ্ গদ্ হইয়া আমার গণ্ডদেশ চুম্বন করিল।

শৈলবালা ও সেই যুবকের সম্বন্ধে ভিখারিণী বলিল, "আমি এত স্থান ভ্রমণ করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধান করিতে পারি নাই; আর দুষ্ট কাপালিকও সেই পর্য্যন্ত জীবিত আছে কি না, তাহারও কোন সন্ধান নাই।"

ভিখারিণীর সব কথার শেষ হইল। তাহার সংবর্দ্ধনার কারণ আমি দাসীগণকে বিশেষ মত উপদেশ দিলাম। পরে দুইজনে একত্র আহারে যাইলাম।

সেই দিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে কাপালিক ও শৈলবালা, যুবক, প্রভৃতি সমস্ত অভিনেতা আমাকে অনেকবার দেখা দিয়া গেল।

ভিখারিণীর কথায় আমি একত্র শয়ন করিলাম। ভিখারিণী আমায় যথার্থ মাএর মত স্নেহ করিতে লাগিল।

হেমচন্দ্রের পত্র—কায়াহীন মুণ্ড।

হেমচন্দ্রের কলিকাতা যাত্রার পর সপ্তাহ অতীত। তিনি দুই তিন দিন বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আজও তিনি ফিরিলেন না। ভিখারিণী সরলার সহ কথোপকথনে ও পুস্তকপাঠে যদিও দিবা এক রকমে কাটিয়া যাইত, কিন্তু রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া হেমচন্দ্রের সকল কথা মনে পড়িত। কেন তিনি এরূপ ভাবে পত্রপাঠ করিয়াই কাহারও নিকট কোন কথা

প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন? কেন তিনি আমাকে একখানি পত্র পর্য্যন্ত লিখিলেন না? যে ব্যক্তি আমাকে সেই গোপনীয় পত্র লিখিয়াছিল, হেমচন্দ্র কি তাহাকে শঙ্কা করেন? হেমচন্দ্র যদ্যপি সেই ব্যক্তির অপেক্ষা ধনী না হয়েন, তাহা হইলে বা সে টা ক্ষোভের বিষয় কি? তাঁর যাহা আছে, তাহাই আমাদের যথেষ্ট। যদি তাহাও না থাকিত, তাহা হইলেই কি হেমচন্দ্রের প্রতি আমার সম্মান বা অকৃত্রিম প্রণয়ের ব্যাঘাত ঘটিত? তিনি রাজা হইলে আমি রাজবাটীতে রাজ-ভোগ খাইয়া বহুমূল্যের রত্নালঙ্কার পরিয়া যে সুখে থাকিব, তিনি ভিখারী হইলেও আমি ভিখারিণী হইয়া গাছতলায় দিনান্তে এক মুষ্টি শাকান্ন ভোজন করিয়াও তদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করিব; তবে আমার নিকট আর লজ্জা কি।

আমি তাঁর দাসী। তিনি ক্রোরপতি হইলেও তাঁর দাসী, তিনি কাঙ্গাল হইলেও তাঁর দাসী; তবে তিনি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এরূপ লজ্জিত ভাবে বাটী হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি কি ভাবিলেন যে, কোন বড়লোকে আমায় এক খানা পত্র লিখিয়াছে বলিয়া আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের নিকট যাইব? যদ্যপি তিনি তাহা ভাবিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি রমণী-চরিত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। রমণী হৃদয় বিমল প্রেমে পরিপূর্ণ। প্রেমের কারণ অবলা কামিনী যে কতদূর কষ্ট স্বীকার করিতে পারে, তা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।

রমণী প্রেমের দাসী। রমণী প্রেমের কারণ না করিতে পারে

এমন কার্য্যই নাই। রমণী হৃদয় সুকোমল কমল অপেক্ষা কোমল হইলেও প্রেমের অনুরোধে দুঃখ সহিষ্ণুতার জাজ্বল্যমান্ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

হেমচন্দ্র জ্ঞানী ও বিদ্বান্। তিনি এত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু রমণী হৃদয়ের মূল্য বুঝিতে পারেন, এমন শাস্ত্র কি কখন পাঠ করেন নাই? হেমচন্দ্র এবার আসিলেই তাঁকে নিজে আমি প্রেমের পড়া পড়াইব। তাঁকে প্রেমের দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিব। প্রেমের শিক্ষা দিয়া প্রেমিক করিব।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি উদ্যানে নামিলাম।

সূর্য্য ডুবু ডুবু প্রায়। পশ্চিমাকাশ নানা বর্ণের মেঘে যে কি অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে দেখিলে, চক্ষু জুড়াইয়া যায়। পাখী গুলি দলে দলে কলরব করিতে করিতে বৃক্ষশাখায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। স্বচ্ছ সরসী সলিলে সরোজিনীকে মুদিত হইতে দেখিয়া চক্রবাক চক্রবাকী পরস্পরে বিলাপ করিতে করিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতেছে। বিরহিণী কুমুদিনী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সুবদন বিকাশপূর্ব্বক উর্দ্ধমুখে চাহিয়া প্রিয় নিশানাথ সমাগম অপেক্ষা করিতেছে। আমি ধীরে ধীরে আসিয়া, হেমচন্দ্র সরসীকূলের যে চাঁদনীতে বসিতেন, সেই স্থানে আসিয়া বসিলাম।

সেই স্থানে আমি হেমচন্দ্রকে প্রথমে সেতার বাজাইতে দেখি, সেই স্থান হইতে আমাদের প্রথমে চারিচক্ষু একত্রিত হয়। মৎস্যগণ আনন্দে জলমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহাই দেখি-তেছি; এমন সময় বামাঠাকুরুণ আস্তে আস্তে আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল।

আমি মাথা তুলিয়া বলিলাম, কি গো ঠাক্‌রুণ! কি মনে করে?

বামাঠাকরুণ সেই হাসিমাখা মুখ খানিতে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "হাঁ মা সুরবালা! ক দিনে যে মুখখানি শুকিয়ে গেছে! কিসের ভাবনা মা?"

আমি মনে করলুম যে, মাগীর কি আক্কেল দেখেছ! জেনে শুনে আবার ন্যাকাপণা কচ্ছেন! লজ্জায় আমার কেমন মুখে কথা এলো না। বামাঠাকুরুণ আবার পরিহাস করে বল্লে, "আয় গো সাগর ছেঁচা মাণিক!' বাবুর পত্র এসেছে, পড়ে দেখ্।" এই বলিয়া আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া তিনি বক্র দৃষ্টি করিতে করিতে বাটীর মধ্যে চলিয়া গেল।

আমি কম্পিত হস্তে পত্রের আবরণ ঘুচাইয়া পড়িলাম,—

(পত্র)

কলিকাতা,

১লা আশ্বিন।

"প্রাণাধিকা সুরবালা।

বাটী হইতে আসিবার সময়, আমি যে প্রকার ভাবে তোমায় রাখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে তুমি আমাকে মহা অপরাধী করিতে পার; কিন্তু সুন্দরি! যদি জগৎপাতার কৃপায় কখনও সময় পাই, তখন মনের কথা খুলিয়া বলিব। তোমার মুখচন্দ্রের অদর্শনে আমার মন যে কিরূপ ভাবের অধীন হইয়া রহিয়াছে, তাহা আর তোমায় প্রকাশ করিয়া কি লিখিব। বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে আমার আর চারি পাঁচ দিবস বিলম্ব হইবে। যে বিষয়

অপ্রকাশ রাখিতে অনুরোধ করিয়া আসিয়াছি, তাহা যেন তোমার স্মরণ থাকে। আজি এখানে তোমার কারণ দুই তিনটী বড় উৎকৃষ্ট জিনিষ কিনিয়াছি, সঙ্গে লইয়া যাইব। আমার কারণ কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। তুমি মনের সুখে থাকিবে, তাহার অপেক্ষা বোধ হয়, আমার আর কিছুই নাই। বাটীর আর আর সকলকে আমার কুশল সংবাদ দিবে; আর নিজে খুব সাবধানে থাকিবে ইতি—

তোমারই

হেমচন্দ্র।"

পুঃ—

"সৌভাগ্য বশতঃ আমার এখানে একজন স্থবির সাধুর সঙ্গে আলাপ হইয়াছে; বোধ হয়, বাটী যাইবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

পত্র পাঠ করা শেষ হইল।

যে চিন্তায় দিবারাত্র চিন্তিত ছিলাম, হেমচন্দ্রের পত্র পাইয়া সে চিন্তা দূর হইল। যেমন মাথা তুলিলাম, অমনি দেখিলাম যে, সরোবরের অপর পারে প্রাচীরের উপর একটা মানুষের মাথা!

সেটা আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। আমি একেবারে ভয়ে জড়সড়।

মনে করিলাম চীৎকার করি, কিন্তু ভয়ে যেন বুক চাপিয়া ধরিল, কথা ফুটিল না। মুণ্ডও আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমিও সভয়নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া আছি। বোধ হইল, কেহ ভয় দেখাইবার কারণ একটী মাটীর মাথা ঐখানে বসাইয়া

রাখিয়াছে কেন না, তাহাকে জীবন্ত মানুষ বলিয়া কখন বোধ হয় না। কারণ, প্রাচীর এত উচ্চ ও ধারে বালি চূণেতে লাল করা যে, বাহিরে হইতে উঠিয়া কেহ সেখানে দাঁড়াইতে পারে না। আর জীবন্ত মানুষ হইলেই বা সে ওরূপ নিশ্চল ভাবে কিরূপে থাকিবে। সেটাও যেমন, তেমনি আমিও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেন স্থিরদৃষ্টিতে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ভয়ে যেন আধমরা হইলাম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল। আর চক্ষে ভালরূপ দেখা যায় না; তত্রাচ, সেই কৃষ্ণবর্ণ মাথাটা আমি আকাশের আলোকে বেশ দেখিতে পাইতে লাগিলাম।

কিন্তু আমি ভয়ে এতদূর অভিভূত হইয়াছিলাম যে, সে স্থান হইতে এক পাও উঠিতে পারিলাম না।

আমার বিলম্ব দেখিয়া ভিখারিণী সরলা, দুইজন পরিচারিণী সঙ্গে করিয়া বাগানে আমার অন্বেষণ করিতে আসিল।

আমি এমনি স্তম্ভিতভাবে বসিয়াছিলাম যে, তাহাদের উপস্থিতি কিছুমাত্রই জানিতে পারি নাই। কিন্তু যখন ভিখারিণী সরলা তার সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা! মা! অন্ধকারে একলাটী এখানে বোসে কি কচ্ছিস্ মা? তোর মেয়ে যে তোকে কত জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা কি তুই জানিস্ নে মা?" আমি সেই প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, ঐ দেখ।

সকলে বলিল, "কৈ মা?"

আমি বলিলাম, ঐ পাঁচিলের উপর।

সরলা বলিল, "মা! অন্ধকারে তো পাঁচিল দেখা যাচ্ছে না।"

তখন আমার মোহ ভাঙ্গিল। আমি দেখিলাম যে, সত্য সত্যই আর দুই হাত অন্তরে কিছুমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। আমি ভয়ে ও সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হয়ে অন্ধকারেও সেই কায়াহীন মুণ্ড দেখিতেছিলাম।

সরলা সস্নেহে বলিল, "পাগলীর মাও পাগলী! কৈ, আমরা তো কিছুই দেখিলাম না।" তখন আমি সংক্ষেপে সমস্ত বলিলাম। শ্রুতমাত্র দাসীরা দেউড়ীতে সংবাদ দিল। দশ পনের জন দরওয়ান, অস্ত্র শস্ত্রাদি ও আলোক লইয়া উপস্থিত হইল এবং আমার উপদেশ মত মই দিয়া পাঁচিলের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও জন-সমাগমের চিহ্ন দেখা গেল না।

একত্রিত হইয়া সকলে বাটীর ভিতর গেলাম। সেই মুণ্ডটাকে উপদেবতা বলিয়াই প্রতিপন্ন করা হইল এবং সকলে কহিতে লাগিল যে, আমার আর একাকিনী সন্ধ্যা দুপুরে বাগানে যাওয়া হবে না; কেন না, উপদেবতার দৃষ্টি আমার উপর পড়িয়াছে।

ভোজনান্তে শয়ন করিয়া সেই কায়াহীন মুণ্ড বার বার স্বপ্নে দেখা গেল। সে যেন চক্ষু ঠারিয়া আমায় কত কি বলিতে লাগিল। ভয়ে সে রাত্রে আমি অনেকবার চমকিয়া উঠিয়া-ছিলাম।

শত্রুকরে বন্দিনী।

আমি আর সন্ধ্যা দুপুরে বাগানে যাই না। সরলার সঙ্গে নানা প্রকার কথা বার্ত্তায় দিন যায়। সরলা আমাকে কত কি গান শিখাইতে লাগিল। ক্রমে আমার সেই কায়াহীন মুণ্ডের ভয় ঘুচিয়া আসিল।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। শরৎকালের পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় জগৎ সংসার উছ্‌লাইয়া পড়িতেছে আকাশে চাঁদ হাসিতেছে। বাগানে ফুল হাসিতেছে।

চাঁদের সঙ্গে আমার চিরকালই যেমন ভাব, তেমনি ঝগড়া। সেই যে রাত্রে হেমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম প্রেমালাপ হয়, যে দিনে যুবতী হৃদয়ে প্রেমাঙ্কুর উৎফুল্ল হয়, সেই দিনে চাঁদকে মারিতে চাহিয়াছিলাম বলিয়া চাঁদ অনেক দিন ভয়ে আমার সহ সাক্ষাৎ করে নাই। একমাস পরে সেই চাঁদ আকাশে উঠিয়াছে গরবে ঢলচলিত হয়ে পূর্ণ বাহারে উঠিয়াছে। সেই চাঁদ দেখিব বলিয়া মনে বাঞ্ছা হইল।

ভিখারিণীকে চুপি চুপি বলিলাম, হাঁ মা! বাগানে যাবি?

সরলা বলিল, "ও মা" সেই গলা কাটা আছে মা! গিয়ে কাজ নাই মা!

আমি বলিলাম, দুর, পাগ্‌লী বেটী! গলা কাটা কি তোর আজও বসে আছে। সরলা বলিল, "কেন যাবি মা?"

আমি বলিলাম, মা! চাঁদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের ঝগ্‌ড়া আছে। আজ ভাব কর্ব্বো বলে, তাই যেতে চাচ্চি।

সরলা বলিল, "আর কারেও সঙ্গে নিবি নে মা?"

আমি বলিলাম, না মা! আমরা মায়ে ঝীয়ে যাব। আমি বড় গোলমাল ভালবাসি না। বেশী লোক থাক্‌লে চাঁদ কথা কয় না। "তবে চল মা পাগ্‌লী মায়ের পাগ্‌লী মেয়ে!" এই বলিয়া ভিখারিণী আমার সঙ্গে বাগানে চলিল।

কতক্ষণ যে আমরা নামিয়াছি, তা জানি না। চাঁদের সঙ্গে কত কথা কইলেম, ভাব কল্লেম; বল্লেম যে, তোমারে আমি আর মার্‌বো না, তোমার ভয় নেই। তবে আমি কথা কইলে তুমি কথা না কইলে, আমার ঝগড়া হবে।

ভিখারিণী আমার জন্যে ঘাটে ব'সে তোড়া বাঁধ্‌ছে, আমি ফুলের কেয়ারির মধ্যে বসে চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রইছি; এমন সময় পশ্চাৎ দিকে শুক্নো পাতার মর্ম্মর শব্দ হলো। আমি ভয়ে যেমন উঠে দাঁড়ায়েছি, অমনি চারি পাঁচ জন লোক আসিয়া আমার মুখে কাপড় দিয়া, আমায় ধরা ধরি করিয়া তুলিয়া লইল এবং নক্ষত্রবেগে বাগানের প্রান্তভাগে লইয়া গেল।

আমার চক্ষু আবদ্ধ থাকায় আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমাকে যেন তারা অতি সাবধানে কোন উচ্চ স্থানে তুলিতে লাগিল। তার পর যেন আবার ধরাধরি করিয়া অন্য-দিকে ঠিক্ সেই ভাবে নামাইতে লাগিল।

আমার বিবেচনা হইল যে, তারা আমাকে লইয়া বাগানের পাঁচিল পার হইল। যদিও তাহারা ধীরে ধীরে কথা কহিতে ছিল, তত্রাচ, বোধ হইল যেন সেখানে উহাদের অপেক্ষায় আরো

লোকজন ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল "কাজ হাসিল হইয়াছে?"

আমার হরণকারীর মধ্যে একজন বলিল, "কাটামুণ্ডের অসাধ্য কি?"

তখন সেই কয়াহীন মুণ্ডের বিষয় আমার হৃদয় মধ্যে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভিখারিণী সরলার নিষেধ মনে করিয়া মনে মনে কাঁদিতে লাগিলাম।

আহা! না জানি দুঃখিনী এতক্ষণ আমায় না দেখিয়া কত কান্নাকাটী করিতেছে। সহসা আমার হরণকারীদের মধ্যে এক-জন একটী তীব্র শিসের শব্দ করিল। দুই চারি লহমার মধ্যে গাড়ির চাকার শব্দ হইল এবং অতি শীঘ্রই একখানি গাড়ী আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিল।

দুইজনে আমাকে গাড়ীতে তুলিল। চালক সজোরে অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিল তীরবেগে গাড়ী লইয়া ঘোড়া ছুটিল।

শকটে উঠাইয়াই আমার হরণকারীরা আমার চোখ মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। আমি মুখ খোলা পাইয়াই সক্রোধে অনুনয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাগা! তোমরা আমায় কেন ধরিয়া লইয়া যাইতেছ? আমাকে তোমরা খুন করিবে না কি?"

এক ব্যক্তি উত্তর করিল, "বাছা! তোমার কোন ভয় নাই, যদিও আমরা তোমাকে আনিবার কালে অবশ্য কিছু রূঢ় ব্যবহার করিয়াছি; তত্রাচ, তোমার কোন অনিষ্ট করিবার বাসনা আমাদের নাই। তোমার একগাছি কেশ পর্য্যন্ত কেহ স্পর্শ করিবে না। এখানকার অপেক্ষা বরং যাতে তুমি সুখে

থাক, তাহাই আমাদের ইচ্ছা; আর যিনি তোমায় লইয়া যাইতেছেন, তিনি রাজ্যের এক রাজা।" ধীরে ধীরে প্রভাতের আলোকের ন্যায় আমার মনে অনেক প্রকার ভাবের উদয় হইতে লাগিল। ছাদের উপর হইতে সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আমাকে দৃষ্টি, তার অনতি বিলম্বে সেই সন্দেহজনক পত্র, সেই সঙ্গে হেমচন্দ্রের কলিকাতা যাত্রা, সেই কায়াহীন মুণ্ডের কথা, তার পরেই অপহরণ। পত্রে তো স্পষ্টই লেখা ছিল, "যে প্রকারেই হউক, তোমাকে আমার করিব।" এ সকলই এক ব্যক্তির কাজ।

সে যে আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া, আমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে, তাহা আর জানিতে বাকী কি। কিন্তু যখন তার হস্তে পড়িয়াছি, তখন কিরূপে উদ্ধার পাইব।

হেমচন্দ্র অপেক্ষা যে, সে ব্যক্তি ধনী, তাহা সকল রকমেই বুঝিয়াছি; কিন্তু হেমচন্দ্র আমার জীবনদাতা, হেমচন্দ্র আমার হৃদয়ের ধন, আমার চক্ষের আলোক। হেমচন্দ্র বাটীতে আসিয়া আমায় না দেখিয়া কি করিবেন, ইহা ভাবিয়া, আমি সারা হইলাম।

হেমচন্দ্র কি আমাকে তাঁর প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন? আমি কি আবার তাঁর পাশে বসিয়া সেই মুখচন্দ্র দেখিতে পাইব? তাঁর সেই মধুমাখা কথা শুনিতে পাইব?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি, এমন সময় এক বৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাৎ ভাগে গাড়ী থামিল।

প্রাচীরের মধ্য দিয়া একটী ক্ষুদ্র দ্বার খোলা হইল। আমার সঙ্গীরা আমাকে তথায় প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল।

আপত্তি করা নিষ্ফল জানিয়া আমি আর কিছুমাত্র না কহিয়া, দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

সহসা শঙ্খঘণ্টাধ্বনি সহ মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

এক একটী করিয়া চারিদিকে দশ বিশটি আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

ভিখারিণীর আখ্যায়িকার সূত্রে সেই কাপালিকের চণ্ডীর শোণিত-পার্ব্বণের কথা অমার মনে পড়িয়া গেল। আমি ভাবিলাম যে, আমার বুঝি আজ সেই দিন উপস্থিত।

কিন্তু সেই যুবকের যেমন শৈলবালা ছিল, আমার তো এখানে কেহ নাই। মন বলিল, "বালাই! কেন তোর তো হেমচন্দ্র আছে।" কিন্তু হেমচন্দ্র কোথায়! তিনি নিকটে থাকিলে, কি আজ আমায় দস্যুতে অপহরণ করিতে পারে?

ভাল, তাই যেন হ'লো; কিন্তু যার সংসারে কেহ নাই? তার সেই কাঙ্গালের সখা দীননাথ হরি আছেন।

শুনেছি, তিনি ভীতার্ত্তের ভয়হারী, ভক্তের হৃদয়বিহারী ভবপারের কাণ্ডারী, দুঃখের দমনকারী, তিনি যখন আমার আছেন, তখন আর আমার আবার ভয় কি?

সেই শ্রীহরিকে স্মরণ করে আমি মনের শঙ্কা দূর করে, কিঙ্করগণের সঙ্গে চল্লেম। বোধ হয় আগমনের আশায় এই সকল উদ্যোগ পূর্ব্ব হইতেই করা ছিল।

আমাকে উপরের একটী মহামূল্যবান্ দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত গৃহ মধ্যে রাখিয়া, দাসগণ চলিয়া গেল। সাবধানের কারণ তারা দ্বার রুদ্ধ করিয়া গেল। আমি শত্রুকরে বন্দিনী হইলাম। কেহ কিছুই জানিল না।

বসন্তকুমার—পতিনিন্দা।

রাত্রি এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত আমি সেই সুসজ্জিত গৃহমধ্যে একাকিনী বন্দিনী ভাবে রহিলাম।

কত কি ভাবিতেছি, তাহার আর কূল নাই। দুঃখিনী সরলা আমার হঠাৎ অন্তর্দ্ধানে না জানি কত কন্নাকাটী করিতেছে। বামঠাকুরুণ ও অন্যান্য পরিচারিণীগণ আমার অদর্শনে বোধ হয়, বড়ই ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছে। সকলে আমার অন্বেষণের কারণ কতই ছুটোছুটি করিতেছে; কিন্তু আমি পোড়াকপালী যে শত্রু করে বন্দিনী, তা হয় তো কেহই জানিতে পারিল না।

কতক বা বিধাতাকে কতক বা অদৃষ্টকে কতক বা কর্ম্মফলকে ধিক্কার দিলাম।

কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না আমি পোড়াকপালী যে বন্দিনী সেই বন্দিনীই রহিলাম।

হঠাৎ বাহির হইতে তালা খোলার শব্দ পাইলাম। ধীরে ধীরে দ্বারটি উন্মুক্ত হইল এবং একজন দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি ভয়ে জড়সড় হইয়া ঘরের একটি কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কৃষ্ণকায় পুরুষ গৃহের মধ্যস্থলে আসিয়া, প্রস্তরময় মেজের উপর হস্ত রাখিয়া দাঁড়াইল।

দীপালোক তার মুখে পড়াতে আমি ভালরূপে তার মুখশ্রী ও অবয়ব দেখিতে পাইলাম।

তার মস্তকে বড় বড় বাবরী কাটা কেশ, ভ্রূ দুখানি জোড়া

নাকটি সুশ্রী, ঠোঁট দুখানি পাতলা ; কিন্তু এমনি ভাব যে, দেখ্‌বা মাত্র বড় দাম্ভিক বলিয়া জ্ঞান হয়।

চোখ দুটী বড় বড়, ফালি চের', খুব জ্যোতিপূর্ণ ; কিন্তু তাতে লাম্পট্যভাবের দৃষ্টিই অধিক। বক্ষঃস্থল খুব প্রশস্ত, বাহু দুখানিও বলবিশিষ্ট জ্ঞান হয় ; গলায় দীর্ঘ যজ্ঞসূত্র। বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর। পরিধানে একখানি অতি চিক্কণ কালাপেড়ে ধুতি। ঘোমটায় আমার সমস্ত মুখমণ্ডল ঢাকা।

কৃষ্ণকায় পুরুষ কিছুকাল আমার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "সুরবালা!" আমি চমকিয়া উঠিলাম। এ ব্যক্তি কিরূপে আমার নাম জানিল? আমি তো বর্দ্ধমানে কাহাকেও চিনি না। পুনর্জ্জীবন লাভ হওয়া পর্য্যন্তই হেমচন্দ্রের বাটীতে আছি। কাক পক্ষীতেও আমায় দেখিতে পায় না। হেমচন্দ্র ও বামাঠাকুরুণ ব্যতীত বোধ হয়, বর্দ্ধমানে কেহই আমার নাম জানে না। তবে যাহাকে আমি কখন দেখি নাই এবং আমাকেও যে দেখে নাই, তখন সে ব্যক্তি কিরূপে আমার নাম জানিল? হঠাৎ আমার সেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা মনে পড়িয়া গেল। যে দিন হেমচন্দ্রের সহিত বাতায়ন হইতে আমাদের প্রথম চারি চক্ষু একত্রিত হয়, সেই দিনে সেই ক্ষণে দূরে একটী বড় বাড়ীর ছাদের উপর হইতে এক ব্যক্তিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা আমার প্রতি লক্ষ্য করিতে দেখি। তবে কি আমি সেই ব্যক্তির দ্বারা এই বাটীতে আনীত হইয়াছি।

তবে কি যে পত্রপাঠ করিয়া হেমচন্দ্র অভুক্ত কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন, এই ব্যক্তিই কি সেই পত্রপ্রেরক? উভয়টীই সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমি কাঠের পুতুলের মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনশ্চ সেই ব্যক্তি কহিল, "সুরবালা! আমার মুখে তোমার নাম শুনিয়া, তুমি বোধ হয় কিছু বিস্মিতা হইয়া থাকিবে; কিন্তু তুমি বোধ হয় এটা জান যে, এই জগতে কতকগুলি প্রাণীকে কতকগুলি বিষয় শিখাইতে হয় না, সিংহশাবক মাতৃ-গর্ভ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হওয়ামাত্রই হস্তীকে মারিতে পারে; ছাগ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ জন্মকাল হইতেই তৃণ ভোজন করিতে শিখে; ভ্রমরও সব পুষ্পকে পরিত্যাগ করিয়া কমলিনীর মধুপানার্থই গমন করে; তা যে ব্যক্তি তোমাকে এক বার মাত্র দেখিয়া, তোমার রূপের দাস হইয়াছে, তখন সে যে তোমার নামটি অগ্রে শিক্ষা করিবে, তার আর বিচিত্র কি? যে কারণ যে নামটী তার অহোরাত্র জপমালা, তখন সেটী জানা বা শেখা তার পক্ষে অতি সহজ।"

আমার আর সহ্য হইল না। চন্দ্র সাক্ষী করিয়া আমি হেমচন্দ্রের নিকট সত্যে বন্দী হইয়াছি, আমি হেমচন্দ্রেরই। প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্র আমার পতি, আমি তাঁহার পত্নী। তখন এ ব্যক্তি কি সাহসে এবং কোন্ আশার কুহকে পড়ে আমাকে হরণ করে, নিজ অধিকারে এনে, এই সকল অপমা সূচক কথা বল্‌চে। এর কথার উত্তর না দিলে, আমাকে আরো মন্দ কথা শুনিতে হইবে।

এই ভাবিয়া আমি সদর্পে কহিলাম, মহাশয়! আপনি ভদ্র-লোক। আর আপনার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আপনাকে ধনী বলিয়া জ্ঞান হয়। আমি একজন গৃহস্থের মেয়ে, বন্যার জলে ডুবে মর্‌তে মর্‌তে একজন মহৎ ব্যক্তির চেষ্টায় জীবন লাভ করেছি; তাঁর

নিরতিশয় যত্নে ও সেবাশুশ্রূষায় পুনরায় দেহে প্রাণ প্রাপ্ত হয়ে, তাঁর সদব্যবহারে বশীভূত হয়ে, দেবীর ন্যায় আদরে কাল যাপন কচ্ছিলাম। আপনি বিনাপরাধে সেই আশ্রয় থেকে আমায় বল দ্বারা বঞ্চিত করতে কেন প্রবৃত্ত হ'য়েছেন? আমি অবলা রমণী, আমার প্রতি আপনার এ অত্যাচার কেন? আমি এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলাম। হেমচন্দ্রের গুণ সমষ্টির কথা উল্লেখ করিবামাত্র তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল; কিন্তু অতি সাবধানে সেই ভাব গোপন করে বলিল;—

"সুরবালা! যত রত্ন ডুবুরিরা সমুদ্রগর্ভ হ'তে তোলে, তার একটীও কি তারা ভোগ করিবার উপযুক্ত? তা তোমার পক্ষেও সেইরূপ। একটী জলমগ্না সুন্দরীর প্রাণ রক্ষা করিতে কোন্ ভদ্রলোক উপেক্ষা করে। অতএব, সেটা আর বিচিত্র কি। আর যে তোমায় যত্ন করে রাখার কথা বল্‌ছো, সেটাই বা অধিক কি।

"যে পদার্থের যেমন মূল্য, লোকে তাকে সেই রূপ পরিমাণে যত্ন ক'রে থাকে। এই জগৎ সংসারে সকলেই রূপগুণের পক্ষপাতী। হেমচন্দ্র তোমায় কি এমন যত্নে রাখিয়াছে? আমি তোমাকে তদপেক্ষা সহস্রগুণ যত্নে রাখিতে প্রস্তুত। আর এ ছাড়া, হেমচন্দ্র তোমায় ওরূপ ভাবে কত দিন রাখিবে? এ ক্ষমতা বোধ হয় তার বেশী দিনের জন্য স্থায়ী নহে।

"বিষয়-সঙ্কট-কীটে হেমচন্দ্রকে শোষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আর সামান্য দিনের মধ্যে যাহা অর্থ আছে, তাহাও থাকিবে না; তখন তোমার কি দশা হইবে?"

এইবার আমার বুকে বড় লাগিল। তবে কি হেমচন্দ্রের কোন মহা বিপদ্ উপস্থিত? তাই কি তিনি ম্লানমুখে বাটী ত্যাগ করিয়া গেলেন? যাহা হউক, যা অদৃষ্টে আছে, তাহাই ঘটিবে; সে জন্য আর পূর্ব্বে শোক করার প্রয়োজন কি। আমি বলিলাম, স্ত্রীলোক ও বালককে ভয় দেখাইয়া যে ব্যক্তি নিজের ইষ্টসিদ্ধির উপায় দেখে, তার সমান হীনচেতা নিকৃষ্ট ব্যক্তি বোধ হয়, আর দ্বিতীয় নাই।

আমার ঈদৃশ কটু কথা শুনিয়া সে ব্যক্তি একটু হাসিল। সে হাসিটুকু বড় ভয়ঙ্কর। প্রবল ঝড় বা তদনুরূপ কোন নৈস-র্গিক বিপ্লব ঘটিবার পূর্ব্বে যেমন অন্ধকারময় আকাশ সহসা বিদ্যুদালোকে চমকিয়া উঠে, তার অতি সুদৃশ্য কৃষ্ণবর্ণ মুখ-মণ্ডলেও সেই হাসির সেইরূপ শোভা হইল।

ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "সুরবালা! ঐ কথা আর কারও মুখ হতে বেরুলে, বোধ হয় তার আজ মহা দুর্দ্দিন উপস্থিত হইত; কিন্তু তুমি একে রমণী, তাতে সুন্দরী; তোমার মুখে কটু কথা প্রেমিকের কাণে ভাল লাগে; তাই স্থির হয়ে শুনছি। কথাগুলি সহস্র গুণে কটু হলেও তোমার অধরসুধার সহিত জড়িত হইয়া বাহির হওয়ায়, তার আর কিছুমাত্র কটুতা নাই।

"দেখ সুন্দরি! তোমায় হরণ কোরে আনার কারণ আমায় তিরস্কার কর্ত্তে তোমার অধিকার নাই; কেন না, যে দিন থেকে তোমায় হেমচন্দ্রের বাগান বাটীর বাতায়নে দেখেছি, সেই দিন থেকেই তোমায় পাবার আশায় কৌশলজাল বিস্তার করেছি। আর এ ছাড়া সে দিনকার সেই শরসংলগ্ন পত্রের মধ্যেও তোমায়

পূর্ব্ব হ'তে আন্‌তে ত্রুটি করি নাই। কেমন এখন স্মরণ হয়েছে কি ?"

আপনিই কি আমায় দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতেন ?

"হাঁ।"

আপনিই আমায় সেই পত্র লিখিয়াছিলেন ?

"হাঁ।"

আমি সদর্পে কহিলাম, এ সকলে কারণ ?

"তোমার ঐ অকলঙ্ক চন্দ্রবদন, আর আর,—" এই বলিয়া সে ব্যক্তি জানু অবনতপূর্ব্বক আমার পদ ধারণ করিল।

কি আপদ্! মিন্সেগুলো কি বেহায়া গা! মেয়ে মানুষ দেখ্‌লেই কি পোড়া জাতের নোলায় জল আসে! লজ্জা সরম কিছুই মনে থাকে না! মিন্সের আমার দ্বিগুণ বয়েস, সেটা ভাবা নেই, বলা নেই, একেবারে পৈতে গাছটা শুদ্ধ পায়ের উপরে গড়াগড়ি! কি ঘেন্নার কথা মা! বড় রাগও হোল, তার সঙ্গে একটু হাসিও এলো। আমি জড়সড় হ'য়ে বল্লেম, ছি ছি! পা ছাড়ুন। আমার পা ধর্ত্তে কি আপনার লজ্জা বোধ হ'লো না? ইহাতে সে আরো উৎসাহের সহিত কহিল, "সুন্দরি! তোমাকে আত্মবশে আন্‌বার কারণ আমি অনেক বড় যত্ন ও ব্যয় করে তবে সফল হয়েছি। যদি তুমি আমায় ঘৃণা কর, তা হলে আমি নিশ্চয় তোমার এই পদতলে আত্মঘাতী হইব!"

তার রক্তবর্ণ বিশাল চক্ষু, কম্পিত হস্ত ও অনলের ন্যায় শ্বাসপ্রশ্বাস দৃষ্টি করে, আমার অন্তর থর্ থর্ করে কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলাম, এতদিনে বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হইল। হা হেমচন্দ্র! কোথায় হেমচন্দ্র! তুমি আমায়

এক দিন শমনের করাল কবল হইতে রক্ষা করেছিলে, আর আজ এই লম্পট চণ্ডালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কর।

আমার মৌন ভাব দেখিয়া, সে পুনশ্চ কহিল, "কৈ, জীবিতেশ্বরি! প্রসন্ন হইলে না? বিধুমুখ নিঃসৃত কোন আশ্বাস বাক্যই পেলেম না। তবে কি তুমি আমার হবে না? তুমি কি সেই কপট অস্পৃশ্য হেমচন্দ্রকে ভুলিবে না?" এই কথা বলিতে বলিতে সে উঠিল ও বিষধর ফণী যেমন ফণা উদ্যত করিতে থাকে এবং তার সেই উষ্ণ শ্বাস যেমন ললাটে স্পর্শ করে, তেমনি সে ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিল, "তুমি যে আশার চড়ায় সুখের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছ, দেখ, আমি তাহা একটী ফুৎকার বলে উড়াইয়া দিই। ইহা যদ্যপি আমি না করি, তাহা হইলে, আমার দেহে রাজ-শোণিত নাই এবং আমার নাম বসন্তকুমারও নহে।" এই বলিয়া বসন্তকুমার দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

রাক্ষসাচার—উদ্ধার।

আমি অনেকবার কথায় কথায় হেমচন্দ্রের মুখে রাজকুমার বসন্তের কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিতেন, বসন্তকুমারের ন্যায় নির্দ্দয়, স্বার্থপর, দাম্ভিক রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়কুলে কেহ কখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই। তার ইচ্ছা পূর্ণ বা স্বার্থসাধন করিবার জন্যে সে সকল কার্য্যই করিতে পারে; তাহাতে সে কোন মায়া মমতারই অপেক্ষা করে না, কাহারও মুখ চায় না। কাহারও সর্ব্বনাশ করিতে তার মনে কিছুমাত্র মায়া মমতার আবির্ভাব হয় না। স্ত্রীবধ করিতে তার তেমনি মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ জন্মে না।

হেমচন্দ্রের সেই সমস্ত কথা আমার হৃদয়ে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ভাবিলাম যে, আমি তবে এক্ষণে সেই নির্ম্মম, নির্দ্দয় বসন্তকুমারের হস্তে পড়িয়াছি; সে আমার প্রতি অত্যাচার করিতে বোধ হয় কোন কৌশলই পরিত্যাগ করিবে না; তবে আমার উপায় কি? বসন্তকুমারের প্রত্যেক কথার ভাবে বুঝিলাম যে, আমার প্রতি তার সম্পূর্ণ অপবিত্র ভাব। হেমচন্দ্রের যেমন কথা পবিত্র, তাঁর তেমনি সম্ভাষণও পবিত্র; বসন্তকুমারের সমস্তই তার বিপরীত। কিন্তু একটী বিষয় জানিবার কারণ আমার মন বড় চঞ্চল হইল।

বসন্তকুমার, হেমচন্দ্রকে কপটী ও অস্পৃশ্য বলিয়াছে। ইহার কারণ অবশ্যই আমায় জানিতে হইবে। হেমচন্দ্র কি ব্রাহ্মণ নহেন, না, হেমচন্দ্র কোন পাপে কলুষিত হইয়াছেন, তাই বসন্তকুমার তাঁহাকে এরূপ কঠিন কথা বলিল?

শুদ্ধ এই বিষয়টী জানিবার কারণ বসন্তকুমারের সহিত আমার আর একবার কথা কহিতে ইচ্ছা হইল। রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল, তত্রাচ, আমি একখানি কেদারাতে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছি। কিসে বসন্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, তাই ভাবিতেছি, এমন সময় তিনটী স্ত্রীলোক নানাবিধ মিষ্টান্ন ও ফল জল লইয়া প্রবেশ করিল।

জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে, তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণী, বসন্তকুমারের পাচিকা। তাহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা আমাকে অতি বিনীত ভাবে বলিল, "মা! রাজকুমার আপনাকে জল খাইবার কারণ বিশেষ রূপ অনুরোধ করেছেন। আরো বলেছেন যে,

তাঁকে যে স্থান হ'তে আনা হয়েছে, সেখানে পুনঃ প্রেরণ ব্যতীত, এ বাটীতে তাঁর আর সকল রকম স্বাধীনতাই থাকিবে। দাস দাসী সকলেই তার হুকুমে খাটিবে; আর প্রাসাদের এই মহল সমস্তই তাঁর কর্তৃত্বাধীনে রহিল। তিনি যেন সে সমস্ত আপনার ন্যায় ব্যবহার করেন। আর রাজপুত্র অভিমান পরবশ হইয়া যাইবার সময় যদ্যপি কোন রূঢ় কথা বলিয়া থাকেন, তা সে বিষয়ে যেন তাঁকে ক্ষমা করা হয়। যাবৎকাল না তোমার মনঃস্থির হয়, তাবৎ কাল তিনি তোমাকে কোন কথাই বলিবেন না।"

ব্রাহ্মণীর কথায় আমার একটু সুষুপ্ত চৈতন্য জাগরিত হইল। আমি যদ্যপি খাওয়া দাওয়া পরিত্যাগ করে শুধু বসে বসে ভাবনা ভাবি, তা হ'লে, সে বৃথা ভাবনায় কোন ফল দর্শিবে না; অথচ, অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আর যদ্যপি মনের প্রকৃত ভাব গোপনপূর্ব্বক বাহিকে কৃত্রিম ভাব দেখাই, তাহা হইলে, সহজেই নিজ কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব; আর এ ছাড়া, হেমচন্দ্রও দু এক দিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবেন। আমার অপহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিবেন না; অবশ্যই কোন না কোন উপায় করিবেনই। এই সকল চিন্তা করিয়া আমি হাস্য-মুখে বলিলাম, দেখ বাছা! বিধাতা এই হতভাগিনীর ভাগ্যে যে কত কষ্ট লিখেছেন, তা ব'লতে পারি না। যা এড়াবার যো নাই, তা সয়ে নেওয়াই ভাল। তুমি কুমারকে বলিও যে, তিনি যদ্যপি আমার সমক্ষে পনের দিবসকাল কোন অপমানসূচক প্রস্তাব উত্থা-পিত না করেন, তা হ'লে পরে যা হয় দেখা যাবে; কিন্তু তাঁকে

আমার নিকট প্রত্যহ এক একবার হাজির৷ দেওয়া চাই, নতুবা, আমি জানিব, যে তাঁর প্রণয় সকলই মৌখিক, উহাতে কিছুই সার নাই।

আমার শেষোক্ত বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণী একটু ঈষৎ হাস্য করিল। সে মনে স্থির ভাবিল যে, আমি বসন্তকুমারের প্রণয় জালে পড়িয়াছি।

ব্রাহ্মণী রাজকুমারের অনেক গুণ কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীগণের সঙ্গে প্রস্থান করিল। আমি ভাল রূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম।

পর দিবস রীতিমত সময়ে উত্তম সাজগোজ করিয়া বসন্তকুমার দেখা দিল। আমি আর পূর্ব্ব দিনের ন্যায় তার প্রতি অযত্ন বা ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া, কিছু দূরে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া, তার সহিত দু একটি কথা কহিলাম ও মধ্যে মধ্যে আড় চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম।

বসন্তকুমারের মাথা ঘুরিয়া গেল। দাসানুদাসের ন্যায় সে শত বার আমার পদপ্রান্তে মাথা লোটাইল; কিন্তু আমার সেই কথা।

ক্রমে হেমচন্দ্রের কথা পড়িল। অনেক ক্ষণ পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি যে পর্য্যন্ত হেমচন্দ্রকে "কপটী ও অস্পৃশ্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত তার উপর আমার কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছে; কিন্তু যদ্যপি এ কথা বলিবার বিশেষ কারণ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই চিরকালের কারণ তার উপর হইতে আমার মায়া কাটিয়া যায়। সুধু সুধু পরিত্যাগ করায় পাছে অধর্ম্ম হয়, এই আশঙ্কায় পারিতেছি না।

যে রূপ ভাবিয়াছিলাম, ঠিক্ তাহাই ফলিল। বসন্তকুমার

ভাবিল যে, হেমচন্দ্রের উপর হইতে আমার মন ভাঙ্গিবার আর এমন সুযোগ হইবে না।

বসন্তকুমার হাস্য মুখে বলিল, "সুরবালা! তুমি ভদ্রবংশ-জাতা মহিলা। তুমি পাছে ঐ পতিতের সঙ্গে থাকিয়া নিজে পতিতা হও, এই জন্য, আমি ও কথা বলিয়াছিলাম। এক্ষণে জানিলাম যে, তুমি আমার মনের ভাব প্রকৃত রূপে বুঝিয়াছ।

"হেমচন্দ্রের গুহ্য কথা আমি সংক্ষেপে বলিয়া রাখি। হেম-চন্দ্রের পিতা নিশিকান্ত রায়। এই বর্দ্ধমানবাসী জনৈক উচ্চ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ।

"আমাদের সংসারে তার পিতা ও পিতামহ চাকুরী করিয়া কিছু সম্পত্তি রেখে গেছ্‌লেন; তার উপর নিশিকান্তও ইংরেজ সেনাদলে কর্ম্ম করিয়া বিষয় খুব বাড়াইয়া তোলেন। কিন্তু নিশিকান্ত বহুকাল ইংরেজের সমাজে থাকায় ও তাহাদের সহিত আহারাদি করায় তিনি সমাজচ্যুত হন। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমেও অবিবাহিত থাকেন। সমাজচ্যুতি সংঘটন হওয়ায়, তিনি বিবাহের কারণও সাতিশয় উদ্যোগী হন; কিন্তু রাজধানী ও নিকটস্থ গ্রাম সমূহ মধ্যে তিনি কিছুতেই পাত্রী পাইলেন না।

"মেদিনীপুর অঞ্চলে একটী ব্রাহ্মণের এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা ছিল। ধনের লোভে পড়ে সেই ব্রাহ্মণ, কন্যাকে সঙ্গে আনিয়া নিশিকান্তের সহিত বিবাহ দিয়া যায়।

এ কথা অল্প দিনের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতে বহু ব্যয় করিয়াও যদ্যপি নিশিকান্ত রায়ের সমাজে চলিবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বিধবা বিবাহ করাতে তার সে আশা জন্মের মত গেল।

"অল্পকালের মধ্যে নিশিকান্ত রায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হন। তার সঙ্গে সঙ্গেই হেমচন্দ্রের মাতার সম্বন্ধে অনেক অনেক কলঙ্ক কীর্ত্তন হইতে থাকে। কিছুকাল পরে তার গর্ভ হয়। প্রসব হইবার কিছু পূর্ব্বে নিশিকান্ত রায়ের মৃত্যু হয়।

হরপ্রসাদ মিশ্র নামক মুঙ্গের নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ, নিশিকান্ত রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুকালে নিশিকান্ত সেই হরপ্রসাদকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া যান। শুনা যায় যে, তিনি স্ত্রীর দুশ্চরিত্রের কথা সমস্ত জানিয়া, তাহাকে ও তাহার গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যার বিষয় প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিঃসত্ব করিয়া যান। তবে তাদের ভরণপোষণের কারণ কিছু মাসহারা বন্দোবস্ত করেন। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই হেমচন্দ্রের জন্ম হয়।

"হরপ্রসাদ বড় দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, যে, মাতার চরিত্র সম্বন্ধে ক্রোধ করিয়া সন্তানের মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া তিনি সমুচিত ব্যয়ভূষণ করিয়া হেমচন্দ্রকে মানুষ করিতে লাগিলেন। ক্রমে হেমচন্দ্রের বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এই অবসরে হরপ্রসাদ একবার কিছুদিনের জন্য স্বদেশে যান।

"সেই সুযোগে হেমচন্দ্রের মাতা, হরপ্রসাদের উপর কতকগুলি মিথ্যা দোষারোপ করে।

হেমচন্দ্রও মাতার চক্রান্তে পড়িয়া, হরপ্রসাদের অসংখ্য উপকার বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টায় নানা প্রকার কৌশল বিস্তার করিতে থাকে।

"হরপ্রসাদ অতি দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাটী হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়াই মাতা পুত্রের ব্যবহারে সমস্ত বুঝিতে পারেন।

"জন্মকাল হইতে হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার সমধিক স্নেহ ছিল বলিয়া, তিনি হেমচন্দ্রকে মাতার কুপরামর্শ-জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে সিদ্ধমনোরথ হইবার আশা বিরল দেখিয়া, হেমচন্দ্রের পিতার মরণ কালের ইচ্ছাপত্র বাহির করিয়া দেখান। তৎপাঠে হেমচন্দ্র হতাশ হইয়া পড়ে; কিন্তু চতুরা মাতার সাহায্যে হরপ্রসাদের প্রাণ সংহারের সহযোগিতা করে।

"একদিন রাত্রে সহসা হেমচন্দ্রের অন্তঃপুরে হরপ্রসাদের নিমন্ত্রণ হয়। হেমচন্দ্রের মাতা, নিশিকান্ত রায়ের ইচ্ছাপত্র শুনিতে চাহেন। জলযোগেরও যোগাড় হয়। বিষাক্ত খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া হেমচন্দ্রের মাতা হরপ্রসাদের প্রাণ বিনাশের উদ্যোগ করে। কিন্তু দাসীদের ভ্রমবশতঃ সেই দ্রব্যাদি হেমচন্দ্রের মাতা নিজে, খাইয়াই প্রাণত্যাগ করে।

"পরদিন হরপ্রসাদ প্রাণভয়ে কলিকাতায় পলায়ন করিয়া রক্ষা পায় না;

"হেমচন্দ্র মাতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়ার পরই হরপ্রসাদ বাবুর নামে জাল উইল প্রস্তুত করার অপরাধে নালিশ করে।

"হরপ্রসাদ সেই সূত্রে নিশিকান্ত রায়ের ইচ্ছাপত্র অনুযায়িক সমস্ত বিষয়ে দখল পাইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন। এই মোকদ্দমা চালাইতে হেমচন্দ্রের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, অতি অল্পদিনের মধ্যেই মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তি হইবে। মোকদ্দমার

জয়ই হউক বা পরাজয় হউক, হেমচন্দ্রকে পথের ভিখারী হইতেই হইবে।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বসন্তকুমার নীরব হইল!

আমি মনের বেগ সম্বরণ করিয়া কহিলাম যে, এ মোকদ্দমা এতদিন স্থগিত থাকিবার কারণ কি?

বসন্তকুমার কহিল, “সাক্ষ্য অভাবে।” আমি কম্পিত স্বরে কহিলাম, আপনি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কালে বোধ হয় সাক্ষী আছেন?

“আছি।”

আমি পুনশ্চ অনুনয় করিয়া কহিলাম, একজন ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশ হয়, এমন বিষয়ে আপনি সাক্ষ্য নাই দিলেন। বসন্তকুমার তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “সুরবালা! যে ব্যক্তি তোমায় বন্যা জল হইতে বাঁচাইয়াছে, তার জন্য অবশ্য তোমার কষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যদ্যপি তুমি হেমচন্দ্রের উপকারের পরিশোধ দিতে চাহ, তবে এক মাত্র উপায় আছে।”

আমি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রাজকুমার? বসন্তকুমার বলিল, “শোন, নিকটে এস।”

আমি নিকটে যাইলাম। সে আমার কর্ণে দুটী কথা বলিল। শ্রুতমাত্র আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল।

মুখে যাহা আসিল, তাই বলিয়া আমি গালাগালি দিলাম।

বসন্তকুমারও খুব ক্রুদ্ধ হইয়া একখানি রুমালে কি আরক ঢালিয়া আমার নাসিকার নিকট ধরিল; তার পর কি হইল, আমি জানি না; কারণ, তদ্দণ্ডেই আমি অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পড়িলাম।

যখন আমার মোহ অপসারিত হইল, তখন আমি জানিলাম যে, আমার ইহ জন্মের মত সর্ব্বনাশ হইয়াছে। জগতে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই, সেই পাপে আমি পতিত হইয়াছি; যে ধর্ম্ম রমণী জাতির সার ধর্ম্ম, সেই আমার ধর্ম্ম কলুষিত হইয়াছে; যে রত্ন নারীজীবনের অমূল্য রত্ন, আমার সেই রত্ন নৃশংস কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে।

আমি অভাগিনী কি এই জন্য বন্যার স্রোতজলে বাঁচিয়াছিলাম! হা হেমচন্দ্র! তুমি যে আত্মপ্রাণ বিপন্ন করিয়াও হতভাগিনীকে বাঁচাইয়াছিলে; প্রবল জ্বরের যাতনার সময় শীতল দ্রব্য দিয়া যন্ত্রণার উপশম করিতে; তাহার কি এইরূপ শোচনীয় পরিণাম হইল?

আমি কোন্ মুখে হেমচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিব? তিনি পাপিষ্ঠার সঙ্গে আর আলাপ করিবেন কি?

প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে বিহিত; কিন্তু একবার হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া এ জীবন ত্যাগ করিব না। তাঁহার চরণে ধরিয়া মিনতিপূর্ব্বক বসন্তকুমারের অত্যাচারের কথা সমস্ত বলিব। প্রতিহিংসা সাধনের জন্য প্রতিশ্রুত করাইয়া তাঁর সমক্ষে তাঁর সেই ধীর প্রশান্ত প্রকৃতি ও সরল চাঁদ মুখখানি দেখিতে দেখিতে প্রাণত্যাগ করিব; তা হ'লে, আর আমার মরণ-যন্ত্রণা এক প্রকার জানই হবে না। সহসা মুখ তুলিলাম।

কোথায়? আমি কোথায়? এ ত সে গৃহ নহে? তবে কি আমি অচৈতন্যাবস্থায় স্থানান্তরিত হইয়াছি? আমি শয্যা হইতে উঠিলাম।

বাতায়নের নিকট আসিয়া দেখিলাম যে, জানালা গুলি সরু লৌহ শলাকায় মোড়া; বাটীর চতুর্দ্দিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাগান; তার পরেই চারি দিকে বিস্তীর্ণ ময়দান। তবে আমি কোথায় আসিয়াছি?

বসন্ত কি নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া, আমায় পরিণামে কারাগার মধ্যে বন্দিনী করিয়া রাখিল।

আমি ভাবিলাম যে, বর্দ্ধমানের বাটীতে পাছে আমায় রাখিলে, হেমচন্দ্র উদ্ধার করেন, এই আশঙ্কায় বসন্তকুমার আমায় কোন দূরস্থিত স্থানে আনিয়াছে। আর ঐ বাড়ীটীও যে গড়বন্দী করা, তাহাও দেখিতে পাইলাম।

হেমচন্দ্র কি এত দূরবর্ত্তী স্থানে আমার সন্ধান করিতে পারিবেন?

দুরাশা!

যদিও পারেন, তো তিনি কিরূপে এই শত্রুময়ী পুরীতে প্রবেশ করিবেন? হায় হায়! অভাগিনী সুরবালার কবে মরণ হইবে? রাঙা মাকে মনে পড়িল। চক্ষের জলে বস্ত্রাদি ভিজিয়া গেল।

এ রকম অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, তা জানি না। হঠাৎ ঘোড়ার পাএর শব্দ কর্ণগোচর হইল।

উঠিয়া জানালার নিকট গেলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আমার উঠিবার পূর্ব্বেই অশ্বারোহী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। সামান্য কাল মধ্যেই বাহির হইতে কে দরজা খুলিল।

চাহিয়া দেখিলাম, বসন্তকুমারের বাটীর সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

বুড়ী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি মা! ঘুম ভেঙেছে গা?"

তাহার হাসি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। বুঝিলাম যে, আমার অধঃপতনের বিষয় তাহার অবিদিত নাই।

তার কথায় উত্তর না দেওয়ায়, বৃদ্ধা পুনশ্চ কহিল, "বাছা রে! রূপ যৌবন এককালে সকলেরই থাকে, তা ব'লে, কি আর মানুষের সঙ্গে কথা কইতে হয় না?"

আমি কুপিত হইয়া বলিলাম, তোমার কি বলিবার থাকে বল, অত আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? আর অত হেঁয়ালী কাব্যেরই বা দরকার কি?

ব্রাহ্মণী কহিল, "রাজকুমার দেখা করিতে আসিবেন, তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে কি না, তাই দেখিতে পাঠাইলেন।"

তদুত্তরে আমি বলিলাম, তিনি যখন বলে হরণ করিয়া আনিয়া, আমায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আর তাঁর আমায় এ বিদ্রূপ কেন? আমি জাগিয়াই থাকি, বা ঘুমাইয়া থাকি, তিনি মনে করিলেই ত আসিতে পারেন?

ব্রাহ্মণী কহিল, "রাগ ক'রো না বাছা! রাগ ক'রো না; দশ দিন গেলেই সব সয়ে যাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কোন্ স্থান?

"শক্তিগড়।"

এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল। সামান্য কাল মধ্যেই বসন্তকুমার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরিহাস ছলে কহিল,—"সুরবালা! আজ তোমার এ কি ভাব? রাহুগ্রস্থা বিধুর ন্যায় মুখখানি মলিন; কিন্তু তত্রাচ একটী নূতন

শোভায় শোভিত। চক্ষু দুটী ঘুমে ঢুলু ঢুলু কর্‌ছে; কিন্তু আবার এক ধার দিয়ে জলধারাও পড়্‌ছে। কেন সুরবালা! আজ তোমার এ ভাব কেন?"

আমার আপাদমস্তক বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল।

বলিলাম, রাজকুলে যে তুমি এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছ, তা জগৎ অতি শীঘ্রই জানিতে পারিবে। তুমি ভদ্রলোক হইয়া স্বচ্ছন্দে আমাকে বিনাপরাধে আশ্রয়-বিচ্যুতা ক'রে হরণ করে আন্‌লে। আমায় উদ্ধারের আশা দিয়াও শেষে অচৈতন্য করে নিজের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিতোষণ জন্য অধর্ম্মের চূড়ান্ত কার্য্য কর্‌লে? নিরাপরাধা ব্রাহ্মণ কন্যার প্রতি অত্যাচার করিতে কি তোমার মনে একটু হিতাহিত জ্ঞান উদিত হ'ল না? তুমি চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ, রাক্ষস অপেক্ষাও নির্দ্দয়, বিষধর অপেক্ষাও ক্রূর! তোমার বর্ণও যেমন কুৎসিত, মনও তদ্রূপ। তুমি যে ধনমদে গর্ব্বিত হ'য়ে এই বালিকার হৃদয়ে অনন্তকালস্থায়ী বেদনা দিলে, সেই ধনই তোমার অকালধ্বংসের কারণ হবে।"

ক্রোধে আর কথা বাহির হইল না। দুরাচার বসন্ত আমার বাক্যে তিলমাত্র লজ্জিত বা সঙ্কুচিত না হইয়া হাস্য মুখে কহিল, "সুরো! যা হবার তা হ'য়েছে, এখন আর বৃথা কান্না-কাটীতে প্রয়োজন নাই। এখন কি রকম ভাবে থাক্‌লে তোমার মনের অসন্তোষ দূর হয়, তার যুক্তি স্থির করি এসো।"

আমি কুপিত হইয়া কহিলাম, "শৃগাল! কুকুর! তুই আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ! যা ক'রেছিস্ অজ্ঞানে, আর কখন তোর কুবাঞ্ছা সফল হইবার আশা নাই। এ দেহে বিন্দুমাত্র শোণিত থাকিতে তুই আমায় আর ছুঁতে পারবি না।"

বসন্তের কাণে এই কথা বিদ্ধ হইল। সে উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "কি! এখনও এত তেজ দুশ্চারিণি! তোর গর্ব্ব করিবার আর আছে কি? আচ্ছা দেখ্, তোর কি দুর্দ্দশা করি!" এই বলিয়া পাষণ্ড আমার কেশগুচ্ছ সজোরে ধরিল।

আমি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। সহসা সেখানে দ্রুত পদের শব্দ হইল।

রাজকুমার বসন্ত কহিল, "তুই মনে করিস্ না যে, সেই হেমচন্দ্রের সঙ্গে তোর এ জীবনে আর কখন সাক্ষাৎ হইবে।"

"সেটী তোর সম্পূর্ণ ভ্রম কুলাঙ্গার!" বলিতে বলিতে স্বেদ-বারি-বিগলিত-দেহে নিষ্কোষিত অসিহস্তে হেমচন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নৃশংস বসন্তের হস্তে সজোরে আঘাত করিলেন।

সেই মুহূর্ত্তেই দস্যু আমার কেশ ছাড়িয়া কটি হইতে অসি বাহির করিয়া হেমচন্দ্রের দিকে ফিরিল ও সদর্পে কহিল, "কি রে দাসীপুত্র! শৃগাল হ'য়ে সিংহের গহ্বরে কোন্ সাহসে প্রবিষ্ট হ'লি?"

হেমচন্দ্র কোন উত্তর না দিয়া একটী ক্ষুদ্র বংশীধ্বনি করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সমস্ত গৃহ, পুলিশ কর্ম্মচারীতে পূর্ণ হইয়া গেল।

বসন্তকুমার দন্তধারে অধর দংশন করিয়া দূরে অসি ফেলিয়া দিল। আমি দৌড়িয়া গিয়া হেমচন্দ্রের পার্শ্বে আশ্রয় নিলাম।

বসন্তকুমার বিকটস্বরে কহিল,—"হেমচন্দ্র! তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িব!"

পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত দুই জন ইংরাজ ছিল, তাহারা একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল, "রাজকুমার! আপনার নামে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে; আপনাকে আমাদের সহিত কাছারীতে যাইতে হইবে। শীঘ্র চলুন, আমরা অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না।"

বসন্তকুমার দ্বিতীয় কথা না কহিয়া তাহাদের অগ্রে অগ্রে গৃহ হইতে বাহির হইল।

হেমচন্দ্র আমাকে সঙ্গে করিয়া নীচে নামিলেন।

দণ্ডৈক কাল মধ্যে আমরা স্বতন্ত্র গাড়ী করিয়া বর্দ্ধমান রওনা হইলাম।

হেমচন্দ্রের ক্ষমা—ব্রাহ্মবিবাহ।

হেমচন্দ্র আমার উদ্ধার সাধন করিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি আমায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া শত সহস্র চুম্বন করিলেন।

আর আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

হেমচন্দ্র বিস্মিত হইলেন।

তিনি ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সাগরসিঞ্চিত মাণিক! প্রাণপ্রণয়িনি! তোমার চক্ষে জল দেখিয়া আমায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কেন প্রিয়তমে! আর তোমার দুষ্ট বসন্তের শঙ্কা কি?"

আমি লজ্জায় তাঁর হৃদয়ে মুখ লুকাইলাম। আর চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমার বুক ফাটিতেছে।

মৃদুস্বরে বলিলাম, নাথ! সুখের পথে কাঁটা পড়িয়াছে—দুষ্ট বসন্ত আমায় অচৈতন্য করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে; আমি আর তোমায় স্পর্শ করিবার যোগ্য নহি। তবে একটী সাধ আছে, তাই পরিপূর্ণ করিলেই দাসী চিরকালের কারণ বাধিত থাকিবে।

এই মর্ম্মভেদী কথা শুনিয়া হেমচন্দ্র আমার হৃদয় হইতে ফেলিয়া দিলেন না; তিনি অস্পৃশ্যা বলিয়া পদাঘাত করিলেন না; তিনি দুশ্চারিণী, পাপীয়সী বলিয়া তিরস্কার করিলেন না। তিনি আস্তে আস্তে আমার চিবুক ধরিয়া আমার মাথাটী তুলিলেন; একদৃষ্টে আমার বিষণ্ণ মুখ ও সজল নেত্রের প্রতি বহুক্ষণ চাহিয়া একটী সুদীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "প্রাণতোষিণি! যার কারণ অমূল্য জীবন বিপর্য্যস্ত করিতে একবারও চিন্তা নাই, তাকে পরিত্যাগ করা আমার সাধ্য নয়। আর যখন তুমি নিজ ইচ্ছায় কলুষিত হও নাই, তখন সে কার্য্যের পাপ তোমায় অর্শিতে পারে না। প্রিয়তমে! তুমি বিলাপ করো না; তুমি আমার পূর্ব্বেও যে, এখনও সেই আছ। তবে তোমার কি সাধ আছে, প্রকাশ কর; আমি এখনি পূর্ণ করিব।"

আমি যোড়করে কহিলাম, নাথ! নিজ সরলতার গুণে যাই বল, কিন্তু আমার প্রাণ তা বোঝে না। অদৃষ্টে আমার যা ছিল, তাই ঘটিল। আমি এমন নীচপ্রবৃত্তি স্বার্থপর নহি যে, তোমার নিজের সুখেচ্ছায় তোমায় পাপে ডুবাইব। লোকে

তোমার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিবে, এ আমি কখন শুনিতে পারিব না।

তোমাকে একবার প্রাণভরে দেখিব ও তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, তোমার চরণতলে প্রাণত্যাগ করিয়া, প্রাণের এই বিষম জ্বালা ভুলিব; এই আমার সাধ! আর কোন সাধ নাই। প্রাণেশ্বর! বল দেখি, তুমি কি আমায় ক্ষমা করিলে?

এই মাত্র বলিয়া আমি হেমচন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম।

হেমচন্দ্র তদ্দণ্ডেই আমার হাত দুখানি ধরিয়া তুলিলেন ও প্রেমপূর্ণস্বরে কহিলেন, "যে কার্য্যে তোমার অপরাধ নাই, সে বিষয়ে আর তোমায় কি ক্ষমা করিব। তবু বলিতেছি, এই কার্য্যে তোমায় জন্মের মত ক্ষমা করিলাম।"

এই বলিয়া তিনি আমার গণ্ডদেশে শতসহস্র চুম্বন করিলেন।

অনেক ক্ষণের পরে আমি বলিলাম, যদ্যপি প্রতিহিংসা সাধনের কারণ বসন্তকুমার এই ব্যাপার রটনা করে?

তদুত্তরে হেমচন্দ্র কহিলেন, "রাজদণ্ডভয়ে দুরাচার তা কখনই পারিবে না। কিন্তু যাই হউক, অনর্থক আর বিলম্ব করা উচিত নয়; আমি সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়াছি, অদ্য রাত্রেই আমাদের শুভ পরিণয় কার্য্য পরিশেষ করিব; কারণ, কখন কি বিপদ্ উপস্থিত হয়, তা কে বলিতে পারে? একবার বিবাহ হইয়া গেলে, আর কোন শঙ্কাই থাকিবে না।"

ধন্য হেমচন্দ্র! ধন্য তোমার ক্ষমা! এ দেহ পরিবর্ত্তনে তুমি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে; মানবদেহে কখনই এত ক্ষমা নাই।

পর দিনকার প্রাতের সম্বাদপত্র পাঠে বর্দ্ধমানবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই জানিল, "গত কল্য ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে আচার্য্য ভবদেব শাস্ত্রী মহাশয় স্থানীয় সমাজগৃহে, হেমচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সুরবালা দেবীর শুভ পরিণয় কার্য্য সমাধা করিয়াছেন।" তার পর দিন হেমচন্দ্র বহু দীনদুঃখীদের অন্নবস্ত্র দান করিলেন। অনেক বন্ধুবান্ধবদিগকে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইলেন।

সেই রাত্রে সুখশয্যায় হেমচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমি মনের তৃপ্তিতে নিদ্রা গেলাম। বহু দিনের মনের জ্বলন্ত অনল নির্ব্বাণ হইল।

কাপালিকের প্রায়শ্চিত্ত।

পর দিন প্রত্যূষে ভিখারিণী সরলা দৌড়িয়া আমার শয্যার নিকট আসিয়া ডাকিল "মা! মা! মেয়েকে ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেছ্লি মা? তোর মন কাঁদে নি মা! আমি যে তোর জন্য কত কেঁদেছি মা! তুই যাওয়া অবধি তোর জামাই কিছুই খায় নি মা। আয়্ মা! তোর জামাইকে দেখ্বি আয়্ মা।"

এই বলিয়া সে আমাকে টানিয়া যেখানে পিঞ্জর, সেই খানে লইয়া গেল।

ভিখারিণী মিথ্যা বলে নাই। পিঞ্জর মধ্যস্থিত পাখী যথার্থই কাহিল হইয়াছে। আমাকে দেখিয়াই শুকপক্ষী চারিদিকে আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি হাতে করিয়া যা খাইতে দিলাম, তাহাই সে খাইল।

সরলা বলিল, "মা! মা! বাবা আমাকে কত ভাল বাসিয়াছেন, তোমার জামাইকেও কত ভাল বাসিয়াছেন।" এমন সময় হেমচন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "দেখ প্রিয়ে! কলিকাতা হইতে তোমায় যে পত্র লিখি, তাতে যে একজন সাধুর বিষয় লিখেছিলাম; সেটী তোমার স্মরণ আছে তো?"

আমি বলিলাম, সে দুর্দ্দিনের কথা আমার এ শরীর ধারণেও ভুলিব না।

সাধুর কথা শুনিয়া সরলা বলিল, "মা! বাবাকে সেই সাধুকে আন্‌তে বল্ না মা!

হেমচন্দ্র বলিলেন "আচ্ছা, আমি তাঁকে এই খানে ডেকে আন্‌ছি। তিনি অনেক রকম ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা জানেন। কি জানি, যদ্যপি তাহাতে সরলার কোন উপকার হয়। সাধুর পরিচর্য্যার কারণ নানাবিধ মিষ্টান্ন সাজান হইল, বসিবার আসন বিছান হইল। পরক্ষণেই এক সুদীর্ঘকায় লম্বিত জটাজুটবিশিষ্ট তাপস, হেমচন্দ্রের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

তাঁর প্রবেশ মাত্র পিঞ্জরস্থিত পক্ষী একটী ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। সরলা দৌড়িয়া পিঞ্জরের নিকট গেল; কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ শুক এমনি চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, তাকে আর ভিতরে রাখা ভার হইল।

সাধু, শুকের ঐরূপ ভাব দেখিয়া কিঞ্চিৎ হাসিলেন।

সরলা মাথা তুলিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই "মা! এই সেই দেবীগড়ের কাপালিক!" বলিয়াই মূর্চ্ছা গেল।

হেমচন্দ্র এ সকল রহস্য কিছুই না বুঝিয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতি

লক্ষ্য করিয়া তাপস কহিলেন, "যে পরিতাপানলে আমি বহু দিন হ'তে বিদগ্ধ হ'তেছিলাম, আপনার অনুগ্রহে আজ আমার সেই মনের বাসনা মিটিল। যাদের সন্ধানে আমি সমস্ত ভারত-যাত্রা ভ্রমণ করিয়াছি, আজ আপনার বাটীতে তাহাদের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমার সমস্ত শ্রম সফল হইল। অগ্রে এই সতী রমণীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করুন?"

নানা প্রকার উপায়ে সরলার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল। সরলা দৌড়িয়া গিয়া তাপসের পদপ্রান্তে পড়িল।

তাপস আশ্বাস বাক্যে সরলাকে সুস্থির করিলেন।

তাপসের আদেশ মত কালীপূজার সমস্ত দ্রব্যাদি আনয়ন করা হইল।

পূজা সমাপন করিয়া তাপস কহিলেন, "মা সরলে! আমার কারণ তুমি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছ। তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন চিন্তা করিয়া আমি তোমায় আশ্বস্ত করিতেছি। আর তোমার পাপ নাই, আজ হ'তে তুমি অনুকূল পতি সঙ্গে মনের সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে। আমার বরে আর কোন বিঘ্ন, তোমার সুখের পথে কণ্টক বিস্তার কর্ব্বে না। মা! পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত কর।"

সরলা দ্বার খুলিবামাত্র শুক বাহির হইয়া তাপসের পদ-প্রান্তে প্রণত হ'য়ে মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র ও বাটীর অপরাপর সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক-দৃষ্টে দেখিতে লাগিল।

তাপস কুশাগ্রভাগে শান্তিবারি লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "শরৎকুমার! কালিকার ইচ্ছা যে, তুমি তোমার পূর্ব্ব দেহ

ধারণ কর।" এই বলিয়া জল ছড়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে শুকপক্ষী, উত্তম কান্তিবিশিষ্ট যুবা পুরুষের দেহ ধারণ করিয়া তাপসের চরণে প্রণত হইল।

সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাপস গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "শরৎকুমার! তোমার পত্নী সতীর আদর্শ, ওঁর মনস্তুষ্টির জন্য তুমি কিছুকাল সংসার কর; তার পর, সস্ত্রীক আমার সহিত কাশীধামে সাক্ষাৎ করো।" এই বলিতে বলিতে তিনি অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন।

হেমচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন, ঠিক্ তাহাই ঘটিল। বসন্তকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের এজ্‌লাশে নিজে কোন বিষয় স্বীকার করিলেন না। তবে হেমচন্দ্র সহ শক্তিগড়ে আমায় উদ্ধার করিতে যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারী গিয়াছিল, তাহাদের সাক্ষ্যে বসন্তের কারাবাসের বিনিময়ে পাঁচ হাজার টাকা দণ্ড হইল।

ভগ্নমনোরথ ও সাধারণের নিকট বিশেষ রূপে লাঞ্ছিত হইয়া বসন্ত আর অধিক দিন বর্দ্ধমানে তিষ্টিতে পারিল না। সপ্তাহ কাল মধ্যে তিনি দেওয়ান্ ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের হস্তে বিষয় কার্য্যের ভার দিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন।

সরলা কাপালিকের প্রসাদে নিজ পতি শরৎকুমারকে লাভ করিয়া কিছু দিন আমার নিকটই রহিল। কিন্তু তার পিতার দেওয়ান্ ও বৃদ্ধ সনাতন, শরৎকুমারের পুনর্দ্দেহ প্রাপ্তি সংবাদ সরলার পত্রী পাঠে অবগত হইয়া অতি আনন্দ সহকারে বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা সরলার অনুদ্দেশ কালে তার পিতৃসম্পত্তির যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, সে সমস্ত লইয়া সরলার পিতা অকাল মৃত্যু

সম্বন্ধে নানা প্রকার বিলাপ করিয়া তাহাদের উভয়কে স্বদেশ যাইবার কারণ বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট আসিয়া বলিল, "মা! মা! তোকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বো মা? তোর তরে মা আমি হারাধন পেয়েছি। তুই তোর মেয়ের বাড়ী দেখ্‌তে যাবি নি মা? তোর জামাই যে তোর কাছ থেকে যেতে চায় না। বাবাকে বল না মা, তোতে বাবাতে দুজনে তোর মেয়ের বাড়ী যাবিনা?"

পাপের শাস্তি—বৃন্দাবন

এমন সময়ে হেমচন্দ্র মলিন মুখে গৃহপ্রবেশ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে! গ্রহবৈগুণ্য ক্রমে আমার নিজের সম্পত্তি ছেড়ে বোধ হয় আমায় কিছু দিন স্থানান্তরে বাস করতে হবে। কেন না, বসন্তকুমার নির্ব্বাসন কালেও মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার অনিষ্ট করিয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই। হরপ্রসাদ আমার প্রতিকূলে মোকদ্দমা লইবেন, ইহা আমি স্থির শুনিয়াছি; অতএব, এখান হইতে আমাদের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই অন্যত্র যাওয়া উচিত। তবে কয়েকটি বিশ্বস্ত দাস দাসী নিয়ে আমরা কিছুকালের জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে বাস করি গে। পরে যদি কোন সুবিধা হয় ভালই, নতুবা, সেই পুণ্যধামেই তোমার সঙ্গে এ জীবন অতিবাহিত ক'র্ব্বো।"

বলিতে পারি না কেন, পবিত্র ধাম শ্রীবৃন্দাবন ধামের নাম শ্রুতমাত্র আমার মনে যেন কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল।

আমি পুলকিত ভাবে কহিলাম, দেখ নাথ! আপনার সঙ্গে আমার রাজপ্রাসাদ, বৃক্ষতল, ফুলশয্যা, ধূলিশয্যা সবই সমান। দাসী আজই সব উদ্যোগ করিয়া রাখিবে।

সরলা ও শরৎকুমার একবার তাহাদের স্বদেশ দেখিয়া, আমাদের সহিত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম যাইবার প্রকাশ করিল।

হেমচন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। বামাঠাকুরুণ ও দুই একটী বিশ্বাসী ভৃত্যকে সঙ্গে লওয়া হইল। পর দিবস বাগানবাটীতে চাবি দিয়া আমরা কালনা যাত্রা করিলাম। সরলা ও শরৎকুমার বহু দিবসের পর বাটী যাওয়ায়, আত্মীয় স্বজন ও প্রজাবর্গ তাহাদের দেখিতে আসিল ও আমাদের কারণ যে তারা কাপালিকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, তজ্জন্য আমাদিগকে বহুবিধ ধন্যবাদ দিল।

এতকালের মধ্যে তাহাদের বিদেশ যাত্রার উদ্যোগ হইল। সুচতুর বৃদ্ধ সনাতন আমাদের সঙ্গে চলিল।

প্রথমে আমরা গদাধরের শ্রীপাদপদ্ম সন্দর্শন করিয়া ৺কাশীধামে পৌছিলাম। শ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হইলাম। তার পর, পুণ্যধাম প্রয়াগ ধাম যাত্রা করিলাম। সে স্থানে চারি মাস কাল বাস করিয়া ও গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান করিয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ক্ষালন করিলাম।

পরদিন আমরা শ্রীবৃন্দাবনধাম যাত্রা করিব।

বৈকালে আমি, হেমচন্দ্র এবং শরৎকুমার ও সনাতন নদী সঙ্গমের চমৎকারিণী মনোহারিণী শোভা দেখিতে বাহির হই-

য়াছি, এমন সময় দেখিলাম যে, চড়ার উপর প্রায় শতাধিক লোক একত্রিত হইয়া কি দেখিতেছে। নিকটস্থ হইয়া শুনিলাম, "এক বাঙ্গালিকো ডাকুমে খুন কিয়া!"

বাঙ্গালির নাম শুনিয়া আমরা সকলেই সেই স্থানে গেলাম।

সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল। শবটা দেখিবামাত্র আমি চীৎকার করিয়া উঠিতেছিলাম; কিন্তু হেমচন্দ্র আমার মুখে হাত দিয়া নিবারণ করিলেন।

দেখিলাম যে, সাত ছুরির আঘাতে হৃতসর্ব্বস্ব ও হতপ্রাণ হইয়া, রক্তে মাখামাখি হইয়া সেই চড়ায় উপর বসন্তকুমার পড়িয়া আছে!

ঈশ্বরের প্রতি চাহিয়া ভাবিলাম যে, তিনি আমার প্রতি অত্যাচারের তাহার উচিত মত শাস্তি বিধান করিয়াছেন।

হেমচন্দ্র আমাদের আর সেখানে অধিক ক্ষণ থাকিতে দিলেন না। পুলিশের লোক লাশ চালান দিল।

আমরা ক্ষুণ্নমনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

রাত্রে বসন্তকুমারের সেই বিকৃত মুখভাঙ্গী মনে করিয়া অনেক বার আতঙ্কে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম।

বসন্তকুমারকে যে অভিশম্পাত দিয়াছিলাম, তাহা আজ পূর্ণ হইল। ধনের লোভে বসন্তকুমারকে ডাকাতে কাটিয়াছিল।

অনেক অনুসন্ধানেও ডাকাত ধরা পড়িল না।

তার পর দিন আমারা সকলে শ্রীবৃন্দাবনধামে পৌঁছিলাম।

গিরিগোবর্দ্ধন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে আসিয়া শ্রীমন্দিরে ভক্তবৎসল গোবিন্দজীউর চরণ দর্শন করে ও তাঁর পদরজঃ ধারণ করে বিমল আনন্দ অনুভব করিলাম। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বংশীবট যমুনাকূল কেলিকদম্বমূল প্রভৃতি গোপীবল্লভের বিহারস্থল সমূহ দেখে আনন্দের সীমা রহিল না?

আমাদের বাস করিবার কারণ একটি প্রশস্ত কুঞ্জবাটী ভাড়া করা হইল।

সরলা, শরৎকুমার, সনাতন, হেমচন্দ্র, বামাঠাকুরুণের সহিত আমরা একপ্রকার বৃন্দাবনবাসী হইয়া গেলাম। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিল।

কাল্না হইতে সরলার শরৎকুমারের ও তমলুক হইতে আমাদের আম্লাবর্গ যে খরচ পত্র পাঠায়, তাহাতে আমাদের সকলের সুচারু রকমে চলে।

আমরা প্রাতঃকাল হইতে সাধুদিগের সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রালাপে ও ভগবদ্গীতা পাঠে যথেষ্ট প্রীতিতে কাল কাটাইতে লাগিলাম।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের দুটী সন্তান হইয়াছিল। বালকটীর নাম সুশীল এবং সরলার অনুরোধে কন্যাটীর নাম সরলা রাখা হইয়াছিল।

সুশীল সনাতনের বড় প্রিয়। ক্ষুদ্র সরলা সরলার বড় প্রিয়। পুত্র কন্যার মুখ দর্শন করিয়া হেমচন্দ্রের আর আনন্দের সীমা রহিল না।

তিনি যতই আমার মুখের দিকে চাহেন, ততই বালক বালিকার দিকে দেখেন ও মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসেন।

একদিন বৈকালে আমরা উভয়ে একত্র বসে আছি সুশীল, সরলাকে লইয়া জানালা ও দরজার বাহিরে খেলা করিতেছে। হেমচন্দ্র স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে বলিলেন "প্রিয়ে! এতদিনে আমার সকল মনের সাধ মিটিল; তবে একটি ক্ষোভ রহিল যে, তোমার গুণবতী জননীর কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না।"

রাঙা মাকে মনে পড়ায় অনেক বিলাপ করিলাম। ভাবিলাম, মাগো! তোর এমন গুণবান্ রূপবান্ জামাই দেখিতে পেলি না। হঠাৎ সরলা পাগলিনীর ন্যায় আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিল। তাড়াতাড়িতে তার মুখে কথা ফুটিল না। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলিল, "মা! মা! এমন বৈষ্ণবী কখন দেখিনি না মা, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! আয় মা আয়, ঠিক তোর মত মা! সুশীল ও সরলাকে দুই কোলে নিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাছা! ইয়ে কিসকা লেড়্‌কা লেড়্‌কী ?"

সনাতন বলিল, "জমীদার হেমচন্দ্র রায়ের।" বৈষ্ণবী দুজনের মুখ চুম্বন করিল। সুশীলকে নামাইয়া সরলাকে অনেক ক্ষণ বুকে করিয়া রহিল। তার পর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তার মুখে কত চুম্বন খাইয়া যেন অনিচ্ছায় নামাইয়া দিলেন।

"ছেলে মেয়েটীও একবার কাঁদিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"বৈষ্ণবীকে যাইতে দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, মা! তুই কোথায় থাকিস্ মা? বৈষ্ণবী চক্ষু মুছিতে মুছিতে কহিলেন, "গিরিগোবর্দ্ধনের উপর তুলসী কুঞ্জে।" এই কথা শুনে আমি তোকে দেখ্‌তে এলাম। মা! এমন মা দেখিস্ নে মা, ঠিক্ যেন তোর মা! কিন্তু মা, তিনি চলে গেছেন। ঐ যে, সনাতন সুশীল ও সরলাকে নিয়ে আস্‌ছে।"

সনাতন বালক বালিকা লইয়া আমাদের নিকট আসিয়া কহিল, "মা! এমন বৈষ্ণবী দেখ্‌লে না মা? ঠিক্ যেন তোমার মা!"

হেমচন্দ্র সুশীলকে কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার কোলে গেছ্‌লে বাবা? ভয় করে না?

সুশীল কহিল, "না বাবা! আবার তার কোলে যাব। তুই যাবি নি বাবা?"

আমি সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কার কোলে গেছ্‌লে মা?

সরলা কহিল, "লাঙা দি—দি! আবা—আবা—চ—মা!" বলিয়া আমার আঁচল ধরিয়া নিয়া চলিল।

হেমচন্দ্র কহিলেন, "দেখ, সেই অপরিচিতা বৈষ্ণবীকে দেখিয়া সকলেই যখন প্রশংসা করিতেছে, তখন আমাদের তাঁকে একবার দেখা উচিত।"

উত্তম কথা নাথ! আমার তাঁকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে।

পর দিন প্রাতঃকালে সেই বৈষ্ণবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তুলসীকুঞ্জে যাওয়া স্থির হইল।

বেলা ৮ টার মধ্যে বালক বালিকাদের দুধ খাওয়াইয়া, আমরা সকলে দাস দাসীগণ সঙ্গে গিরিগোবর্দ্ধন অভিমুখে চলিলাম। প্রায় দশটার সময় আমরা সেই পবিত্র গিরিবর দর্শন করিয়া পূজান্তে তুলসীকুঞ্জের সন্ধানে চলিলাম।

সামান্য কালের মধ্যেই সেই মনোহর ক্ষুদ্র কুঞ্জবন দেখিতে পাইলাম।

কুঞ্জের মধ্যস্থলে দুখানি চালা ঘর; চতুর্দ্দিকে নানাবিধ ফুল গাছ।

আমি ক্ষুদ্র সরলাকে কোলে করিয়া ও সরলা সুশীলকে লইয়া প্রথমে আস্তে আস্তে তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম।

গৃহ মধ্যে গিয়া দেখিলাম, একটী সুন্দর বর্ণ বিশিষ্টা বর্ষীয়সী রমণী পশ্চাৎ ফিরিয়া শালগ্রামশিলা পূজা করিতেছেন। তাঁহার লম্বিত কেশ, সমস্ত পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া রহিয়াছে, পরিধান পট্টবস্ত্র। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। বোধ হইল, ঘর রূপে আলো করিয়াছে।

সুশীল করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল ও পরক্ষণেই বালিকারে আধস্বরে ডাকিল, "লাঙা দি—দি!"

রমণী মুখ ফিরাইলেন।

আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

পরক্ষণে আমি রাঙ্গা মায়ের গলা জড়াইয়া বসিলাম। মা ও মেয়ে দুই জনে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

মায়ের মুখে কথা ফুটিল না। আমার রব শুনিয়া হেমচন্দ্র সনাতন ও অন্যান্য সকলেই গৃহমধ্যে আসিলেন এবং দেখিয়াই

হেমচন্দ্র সানন্দে কহিলেন, "মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ যে হবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি।"

আমি বাক্‌শক্তি পাইয়া কহিলাম, "মা! মা! তোর জন্য আমি এক দিনের জন্যে সুখী হ'তে পারি নি, তোর আজ ছ বছরে কোন সন্ধান কর্‌তে পারি নি। মা! মা! আজ আমার শুভ দিন।

মা! সেই চিরমধুমাখা স্বরে বলিলেন, "হরি! এতদিনে দুঃখিনী মাএর জলন্ত হৃদয় সুশীতল করিলেন।"

হেমচন্দ্রকে দেখিয়া মা ঘোমটা দিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! উনি কে?"

আমি বলিলাম, মা! ওঁর প্রসাদেই, আজ তোমায় আমায় দেখা হ'ল। উনি আমার জীবনদাতা, আর উনিই তোমার জামাতা, আমার বিবাহিত পতি।

হেমচন্দ্র মাএর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া মাএর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। "বিবাহিত পতি" এ দুটি বলিবার আমার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল।

শুধু "তোমার জামাতা" এই কথা বলিবামাত্র আমার সতী মাএর বদনপ্রতিভা মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল; সেই জন্য, তাঁর মনোগ্লানি দূর করণ জন্য আস্তে ব্যস্তে কহিলাম যে, আমার বিবাহিত পতি।

সুশীল সরলা আমার রাঙ্গা মায়ের দুটি কোন অধিকার করে, তাঁর কেশের আবরণে বসিয়া বেশ সুস্থ মনে হাসিতে লাগিল। রাঙা মা তাহাদেরে গণ্ডদেশ বার বার চুম্বন করিলেন।

ইত্যবসরে এক বৃদ্ধা রমণী একটী কলসী করিয়া জল লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আমাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "ওমা! স্বরী না?"

বৃদ্ধার কটি হইতে কলসী পড়িয়া গেল। ঘর জলে ভাসিল। সুশীল ও সরলা মায়ের কোল হইতে উঠিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।

আমি ফিরিয়া দেখিলাম, রাঙা মায়ের চিরসঙ্গিনী নিশির মা।

মা ত্রস্তভাবে উঠিয়া নিশির মাকে চুপি চুপি কি বলিলেন। নিশির মা হাঁ করিয়া শুনিয়া একটু হাসিল। পরে সরলাকে কোলে নিয়া সুশীলের হাত ধরিয়া। সুশীল কাঁদিয়া উঠিল। নিশির মা বলিল, "কাঁদ কি হে,? তুমি যে আমার বর"! সুশীল চোখ মুছিতে মুছিতে তার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল।

মা সংক্ষেপে আপন বৃত্তান্ত বলিলেন।

আমি ভাসিয়া যাইবার পর, তিনি আমগাছ ধরিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তার পর কিছুদিন, আমার সন্ধান করিয়া হতাশ্বাস হইয়া মা, সমস্ত জায়গা জমী বিক্রয় করিয়া, সেই অবধি বৃন্দাবন ধামে বাস করিতেছেন। নিশির মাও মায়ের সঙ্গে পূর্ব্বাপর আছে।

বন্যার জলে ভাসিয়া যাওয়া হইতে আর এ পর্য্যন্তকার আমার সমস্ত বিবরণ, রাঙ্গা মায়ের কাছে বলিলাম। শুদ্ধ বসন্তকুমারের অত্যাচারের কথাটী গোপন করিলাম। সে কাহিনী বলিয়া আর সতী মাএর শ্রুতি কলুষিত করিলাম না।

কথা সাঙ্গ হইলে, মা ভূমি লুটাইয়া কহিলেন, "দীনবন্ধো!

অনাথশরণ হরি হে! আজ কাঙ্গালিনীর মনের সকল দুশ্চিন্তা দূর হইল। অনাথনাথ! আজ তোমার কৃপায় ধন্য হইলাম। প্রভো! আর আমার জগতে কিছু সাধ নাই, শুদ্ধ তোমার চারু চরণে স্থান দাও, এই ভিক্ষা।"

পরে মা হেমচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "বাবা! তোমার গুণের পুরস্কার দেওয়ায় আর আমার সাধ্য নাই। তুমি যা করিয়াছ, তা সুরবালাই তার পুরস্কার। আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বর তোমায় চিরকাল মনের সুখে রাখুন, আর তোমার শত্রুগণ প্রতিকূলাচরণ ছাড়িয়া অনুকূল হউন।"

সহসা দ্রুতগামী অশ্বের পদ শব্দ হইল। সকলে চাহিয়া দেখিলাম। হেমচন্দ্র যে বিশ্বস্ত ভৃত্যকে বর্দ্ধমানে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ভৃত্য রামদাস।

রামদাস অশ্ব হইতে নামিয়াই হেমচন্দ্রের হস্তে এক খানি পত্র দিয়া প্রণত হইল। পত্রপাঠ করিয়াই হেমচন্দ্র আমার হাতে দিয়া কহিলেন, মায়ের আশীর্ব্বাদ বলিতে বলিতে সফল হইয়াছে।

পত্র খুলিয়া পড়িলাম;

বর্দ্ধমান।

৫ই মার্চ্চ।

"কল্যাণবরেষু"——

কুমার বসন্তকুমারের পরামর্শে যাহা করিয়াছিলাম, তাহার জন্ত অনুতাপিত হইয়াছি। তোমার পিতৃসম্পত্তিতে আমার কোন স্পৃহা নাই। তুমি বর্দ্ধমানে আসিয়া আপনার

সমস্ত বুঝিয়া লইবে। আমায় ক্ষমা করিও, তুমি আসিতে আসিতে বোধ হয় আমি পরলোক গমন করিব ইতি—

আশীর্ব্বাদক

হরপ্রসাদ।

বর্দ্ধমানে ফিরিতে আর কাহারও ইচ্ছা হইল না। হেমচন্দ্র ও আমি, স্থশীল এবং সরলাকে, রাঙ্গা মা ও সরলার নিকট রাখিয়া সামান্য দিনের কারণ আসিলাম। বিষয়াদির স্থবন্দোবস্ত করিয়া আমরা শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরিলাম। হেমচন্দ্রের বিষয় স্থশীলের হইল। শরৎকুমার সরলার সমস্ত সম্পত্তি ছোট সরলা পাইল। আমরা সেই পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনধামেই রহিলাম।

সম্পূর্ণ।